ইচ্ছামতী

সূচীপত্র

রথম পাতাঃ গ্রীষ্ম সংখ্যা ২০০৯..........1

গ্রীষ্মের কথা: নববর্ষের গল্প..........3

ছড়া-কবিতা..........7

বলতে পারিস..........7

কপোলার্থ..........9

গল্প-স্বল্প..........10

ইস্কুলে ভূত..........10

ইচ্ছে মতন: জগন্নাথধামে কয়েকদিন..........21

আনমনে: আমার ছোট্টবেলাঃপর্ব ৩..........26

পড়ে পাওয়া: যখন ছোট ছিলাম..........29

গত সংখ্যায় পেয়েছি: গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য..........30

মনের মানুষ: বিশ্বকবি রবি ঠাকুর..........32

দেশে-বিদেশে..........36

মাটির নিচের রাজপ্রাসাদ..........36

দু'চাকায় দুনিয়া..........46

ছবির খবর: স্বর্গের শিশুরা..........50

বায়োস্কোপের বারোকথা: এডউইন এস পোর্টার..........53

পরশমণি: বাষ্পের ক্ষমতা..........56

জানা-অজানা: চেনা-অচেনা চায়নাটাউন..........58

কমিক্স্ কাহিনী: বাড়ির মধ্যে সার্কাস..........64

এক্কা-দোক্কা: খেলা শুরুর গল্প..........67

আঁকিবুকি..........71

রথম পাতাঃ গ্রীষ্ম সংখ্যা ২০০৯

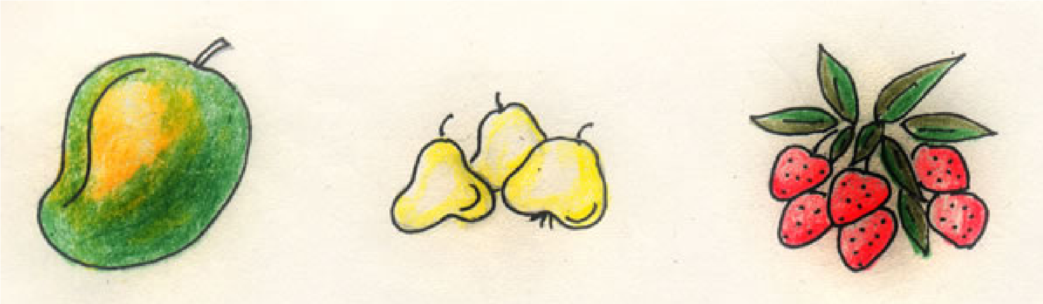

নিঝুম দুপুর। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। দোতলার জানালার গরাদের ফাঁকে মুখ ঠেকিয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে বসে আছি। বাগানের আম-কাঁঠালের ছায়ায় খেলে বেড়াচ্ছে কাঠবেড়ালী। কুব-কুব করে ডেকে চলেছে কুব পাখি। ফলসা গাছের সবুজ- বেগুনি ফলের ফাঁকে ফাঁকে কিচমিচ করছে দুটো শালিখ। জামরুল গাছ ভরে গেছে সাদা সাদা জামরুলে। আম গাছ ভরে আছে কাঁচা পাকা আমে। চোখটা ঘুমে জড়িয়ে আসছে ...ভাবছি একটু পরেই মিষ্টি আম আর ঠাণ্ডা জামরুল খেতে দেবেন মা...এমন সময়ে ধপাস ধপাস আওয়াজ শুনে চোখ ফাঁক করে দেখিকি দুটো ছেলে পাঁচিল ডিঙিয়ে বাগানে ঢুকেছে আর সোজা জামরুল গাছে উঠে পড়েছে। উঠেই ওরা টপাটপ জামরুল তুলে ফেলছে!দেখেই তো আমি দৌড়ে গিয়ে ঠাম্মাকে ডেকে এনে হইচই কান্ড বাঁধিয়ে ফেললাম। কি দুঃসাহস ভাব একবার - আমাদের গাছ থেকে কিনা কাউকে না বলে জামরুল পেড়ে নিয়ে যাবে!- ভাগ্যিস আমি ঘুমিয়ে পড়িনি!

তোমার সঙ্গে এরকম হয়েছে নাকি? আমার ছোটবেলায় কিন্তু এরকম প্রায় এক রুটিন ছিল গরমের ছুটিতে। আমাদের বাগানের গাছগুলি ভরে উঠত নানারকমের ফলে। আর পাড়ার ছেলেরা দলবেঁধে এসে পেড়ে নিয়ে যেত কত ফল। মাঝেমধ্যে অবশ্য আমাদেরকেও কিছু ভাগ দিয়ে যেত।

গরমকাল বা গ্রীষ্মকাল বললেই কি কি মনে পড়ে বলত? প্রথমেই মনে পড়ে স্কুলের লম্বা-আ-আ-আ ছুটি, তাই না? আর গ্রীষ্মের ছুটি বা সামার ভ্যাকেশন মানেই হল ঘুরতে যাওয়া পাহাড়ে বা সমুদ্রে। অথবা মামার বাড়ি বা পিসির বাড়ি...তাই না?বাইরে বেড়াতে গেলে তো কথাই নেই, খালি ঘুরে বেড়ানো আর ভালমন্দ খাওয়া -যত খুশি খাওয়া আইসক্রিম আর কোল্ড-ড্রিঙ্ক, তোমার সাথে সাথে বাবা-মাও কেমন যেন ছোট হয়ে যান ওই কটা দিন... মা-ও আর বকাবকি করেন না বেশি।

অবশ্য গরমের ছুটি মানে খালি আনন্দই নয়। হাতের লেখা মকশো করা, নামতা মুখস্ত করা আর অঙ্ক করার মত কঠিন ব্যাপারও আছে। কিন্তু এসব তো করতেই হবে। এইতো সেদিন নতুন ক্লাসে উঠলে, নতুন বই খাতা এল, এখন তো একটু লেখাপড়া করতেই হবে। আবার স্কুল খুললে পরীক্ষাও আছে! আমি বলি কি, এইসব হাতের লেখা, অঙ্ক কষা আর বেড়াতে যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকেই পড়ে ফেল 'ইচ্ছামতী'র নতুন সংখ্যা - গ্রীষ্ম সংখ্যা ২০০৯।

নববর্ষ, রবি ঠাকুরের আর সত্যজিত রায়ের জন্মদিন, সবই এই সময়ের খুব কাছাকাছি কয়েকটি উতসব বা স্মরনীয় দিন। তাই এই সংখ্যায় একটু করে থাকছেন রবি ঠাকুর আর সত্যজিত। থাকছে নববর্ষের গল্প ও। দেশে-বিদেশে এবার আমরা বিশ্ব-ভ্রমনে যাচ্ছি সাইমন আর ফার্গালের সঙ্গে। দেখতে যাচ্ছি মাটির নীচের এক অদ্ভূত রাজপ্রাসাদ। অন্যান্য নিয়মিত বিভাগের সঙ্গে থাকছে ছোট্ট বন্ধু

সোহিনীর লেখা বেড়ানোর গল্প।

'ইচ্ছামতী'র যারা দেখতে-বড়-আসলে-ছোট পাঠক-পাঠিকা, তাঁরা অনেকেই আমাকে চিঠি লিখে জানান যে ইচ্ছামতী তাঁদের ভাল লাগছে পড়তে। কিন্তু ইচ্ছামতীর কমবয়সী পাঠকদের থেকে চিঠিপত্র যে খুব একটা আসছে না! তাহলে কি ইচ্ছামতী তাদের মনের মত বন্ধু নয়? যাঁরা আমাকে লিখছেন যে 'ইচ্ছামতী' তাঁদের ভাল লাগছে, তাঁদেরকে অনুরোধ করব, পরিবারের ছোটদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন 'ইচ্ছামতী'র, তারা যদি বাংলা পড়তে না পারে, তাহলে তাদেরকে নাহয় পড়েই শোনান। ছোটদের কেমন লাগছে তারা যদি নিজেরা লিখে পাঠায়, তাহলে আমি খুব খুশি হব।

এইখানে দুটো খবর আছে। জনপ্রিয় ই-পত্রিকা 'গুরুচন্ডা৯' এর টইপত্তর বিভাগে 'ইচ্ছামতী'র কিছু পাঠক তাঁদের ভাললাগার কথা বলেছেন। আরেকটা খুব ভাল খবর হল যে 'ওয়াশিংটন বাংলা রেডিও' তাদের ওয়েবসাইটে 'ইচ্ছামতী'কে নিয়ে খুব সুন্দর একটি প্রতিবেদন লিখেছেন। তাদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

তাহলে আর কি? মা কি আমের আচার তৈরি করে ফেলেছেন? তাহলে খানিকটা নিয়ে এস। আচারটা চেখে দেখতে দেখতে পড়ে ফেল নতুন 'ইচ্ছামতী'। আমি বরং আমার সেই হারিয়ে যাওয়া ছোট্টবেলার আম-কাঁঠাল-জামরুল গাছভরা বাগানটার কথা ভাবি...

ভাল থেকো।
চাঁদের বুড়ি।

<u>গ্রীষ্মের কথা: নববর্ষের গল্প</u>

বাংলা বছর, বা বঙ্গাব্দ অনুযায়ী, বৈশাখ হল বাংলা বছরের প্রথম মাস, আর পয়লা বৈশাখ হল বছরের প্রথম দিন। এই দিনটিতে আমরা 'নববর্ষ' পালন করি। 'নববর্ষ' বাঙ্গালিদের একটি সার্বজনীন উতসব। নববর্ষের দিন কি হয় বলতো? প্রথমেই বলতে হয় নতুন জামার কথা। এছাড়া নববর্ষের দিনে বাড়িতে ভালো ভালো খাওয়াদাওয়া ও হয়। ছোটরা বড়দের প্রণাম করে। বড়রা ছোটদের আশীর্বাদ করেন। নানারকমের গান-বাজনার অনুষ্ঠান হয়। যাঁরা ব্যবসা করেন, তাঁরা অনেকেই এইদিনে 'হালখাতা' করেন, অর্থাৎ নতুন বছরের ব্যবসার জন্য নতুন একটি হিসাবের খাতা ব্যবহার করা শুরু করেন। এই দিন সন্ধ্যাবেলা পরিচিত দোকান গুলিতে গেলেই হাতে পাওয়া যায় মিষ্টির বাক্স আর নতুন ক্যালেন্ডার। সবাই একে অপরকে 'শুভ নববর্ষ' বলে সম্বোধন করে।

বাড়িতে কেনা হয় নতুন পঞ্জিকা। পঞ্জিকা কি জানতো? পঞ্জিকা হল আসলে বইএর আকারে একটা ক্যালেন্ডার। দিন ও সময়ের হিসাব ছাড়াও এই বইতে অন্য অনেক তথ্য থাকে, যেমন, সূর্য রোজ কখন উঠবে আর অস্ত যাবে, কবে কোন উতসব হবে, সব লেখা থাকে পঞ্জিকা তে। নদীর জোয়ার-ভাঁটার সময়, পূর্নিমা আর অমাবস্যা কবে -এইসব নানারকম তথ্য ভরা থাকে পঞ্জিকাতে। বাড়িতে দিদান বা ঠাম্মাকে জিজ্ঞেস কর- ঠিক দেখতে পেয়ে যাবে একটা পুরনো বা হয়ত এই বছরেরই পঞ্জিকা। প্রত্যেক নতুন বছর তৈরি হয় একটি করে নতুন পঞ্জিকা। বলতে পার ক্যালেন্ডারের বাংলা নাম হল পঞ্জিকা।

নববর্ষ আর পঞ্জিকা নিয়ে তো কিছু কথা কথা জেনে নিলাম। কিন্তু নববর্ষ উতসব কবে থেকে শুরু হয়েছিল জান কি? আর কে-ই বা প্রথম শুরু করেন আজকের বাংলা সনের হিসাব?
আজকে আমরা যে বাংলা সন মেনে চলি, তার প্রচলন করেন মুঘল বাদশাহ আকবর। আকবরের আগের মুঘল বাদশাহরা হিজরি সন মেনে চলতেন। সেই সময়ের বঙ্গদেশে বছরের হিসাব রাখা হত শকাব্দ মেনে।

AKBAR, EMPEROR OF INDIA.
From Noer's *Kaiser Akbar*, (Frontispiece to Vol. II).

বাদশাহ আকবর

হিজরি সন চাঁদের গতি অনুসরন করে তৈরি করা হয়েছিল। বাদশাহরা এই সনের হিসাবে কর আদায় করতেন। অথচ মুশকিল হল, এই চাঁদের নিয়মে চলা সন ছিল সূর্যের নিয়মে চলা বছরের থেকে প্রায় ১১-১২ দিন ছোট। পৃথিবীর বুকে শস্য উতপাদন হয় সূর্যের গতি-প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তাই হিজরি সন মেনে কর দিতে গিয়ে চাষীদের নাজেহাল নাকাল হতে হত। কারণ যে সময়ে হিসাব করে কর চাওয়া হত, সেই সময়ে তো ফসলই ফলত না। বাদশাহ আকবরই প্রথম বুঝতে পারেন এই অসুবিধার কথা। তাঁর নির্দেশে, আমির ফতেউল্লাহ সিরাজি নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী নতুন ভাবে বছরের হিসাব করা শুরু করেন। এই নতুন ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকার নাম হল তারিখ-এ-ইলাহি। ফসলের সময়ের কথা মাথায় রেখে তৈরি বলে এর আরেক নাম হল 'ফসলী সন'।

৯৬৩ হিজরি সনের (১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) রবিউল আওয়াল মাসের পাশাপাশি পড়ল শকাব্দের বৈশাখ মাস। তারিখ -এ -ইলাহির প্রথম মাস ধরা হল বৈশাখ কে। কিন্ত বছর গোনা শুরু হয়েছিল ১লা মহরম ৯৬৩ হিজরি থেকে।

হিজরি পঞ্জিকা যেহেতু চাঁদের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে, তাই বঙ্গাব্দের থেকে হিজরি বছর ১১-১২ দিন ছোট হয়। গত সাড়ে চারশ বছরের একটু বেশি সময়ে তাই হিজরি সন, বাংলা সনের থেকে প্রায় ১৫ বছর এগিয়ে গেছে।আবার খ্রীষ্টাব্দের থেকে বঙ্গাব্দ সবসময়ই ৫৯৩ বছর পিছিয়ে থাকে।

বাদশাহ আকবরই কিন্তু আদতে শুরু করেন নববর্ষ পালন প্রথা। তিনিই প্রথম শুরু করেন নওরোজ বা বছরের প্রথম দিন পালন করার উতসব।

আকবরের সময় মাসের প্রত্যেক দিনের একটা করে আলাদা নাম ছিল। ভাবো একবার, একত্রিশ দিনের একত্রিশটা নাম। আকবরের নাতি শাহজাহানই প্রথম দিনগুলিকে সপ্তাহে ভাগ করেন এবং পাশ্চাত্য ক্যালেন্ডারের মত রবিবারকে সপ্তাহের প্রথম দিন ঘোষণা করেন। বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের নামে রাখা হয় দিন গুলির নাম।

খ্রীষ্টাব্দের মত বঙ্গাব্দেও ৩৬৫ দিনে বছর হয়। কিন্তু পৃথিবী তো সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে ৩৬৫ দিনের থেকে একটু বেশি সময় নেয়। ঐ বেশি সময়টুকু যোগ করে চার বছর বাদে একবার করে লিপ ইয়ার হয়। সেই বছর ফেব্রুয়ারি মাসের ২৯ দিন হয়, জানোতো?

প্রথমদিকে বাংলা পঞ্জিকা ঐ বেশি সময়ের হিসাব রাখত না। ১৯৬৬ সালে বাংলাদেশের বাংলা অ্যাকাডেমির তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা হয়। এই মতে, বৈশাখ থেকে ভাদ্র, প্রতি মাস হয় ৩১ দিনে। আশ্বিন থেকে চৈত্র, প্রতি মাস হয় ৩০ দিনে। চার বছর পরে পরে চৈত্র মাসে ৩১ দিন হয়।

বাংলা ক্যালেন্ডারের একটি পাতা

বলত, এই বছরটা বাংলায় কত সাল? -ঠিক বলেছ, ১৪১৬ সাল। তোমরা যারা এত সব সংখ্যা দেখে একটু আধটু যোগ-বিয়োগ করা শুরু করে দিয়েছ, তারা নিশ্চয় ভাবছ, হিসাবমত তো বঙ্গাব্দের এত বয়স হওয়ার কথা নয়! ঠিকই ধরেছ, আসলে বঙ্গাব্দ গোনা শুরু হয়েছিল ১ (এক) থেকে নয়,

৯৬৩ থেকেই!! সেইজন্যই তো সাড়ে চারশ বছরের মধ্যেই বঙ্গাব্দ এত্তটা বড় হয়ে গেল। আহা...তুমিও যদি বঙ্গাব্দের মত একটু বড় হয়েই জন্মাতে তাহলে কেমন হত?

জানো কি?

- 'সন', 'তারিখ' -এই শব্দগুলি আরবী ভাষা থেকে নেওয়া। 'সাল' শব্দটি নেওয়া হয়েছে পারসি ভাষা থেকে।

-বাংলা সনের বিভিন্ন মাস গুলির নাম নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন নক্ষত্রের নাম থেকে।

খ্রীষ্টাব্দঃ সারা পৃথিবী জুড়ে সাধারনভাবে যে ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা হয়। এই ক্যালেন্ডারের সময় হিসাব করা হয় ANNO DOMINI (A.D.) নিয়মে। যেমন, এই বছরটি হল ২০০৯ খ্রীষ্টাব্দ বা 2009 A.D।

শকাব্দঃ শক পঞ্জিকা যা শুরু হয়েছিল ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। কেউ বলেন এই পঞ্জিকা শুরু করেছিলান কুষাণ রাজা কনিষ্ক। কেউ বা বলেন এই পঞ্জিকা শুরু হয়েছিল শক রাজা শালিবাহনের মৃত্যুর পর। শকাব্দ ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় মেনে চলা হত। শকাব্দ থেকে ৫১৫ বাদ দিলে বঙ্গাব্দ পাওয়া যায়। আর ৭৮ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়।

হিজরিঃ সারা পৃথিবীর বহু ইসলাম ধর্ম পালনকারী মানুষ এই ক্যালেন্ডার মেনে চলেন। হিজরি সন গোনা শুরু করা হয়েছে 'হিজরা'র সময় থেকে- যে সময়ে ইসলাম ধর্মগুরু হজরত মহম্মদ মক্কা থেকে মদিনায় যাত্রা করেন। বর্তমান হিজরি সন হল ১৪৩০।

অনেক সময়ে নতুন ডায়েরি বা ক্যালেন্ডারে একসঙ্গে খ্রীষ্টাব্দ, বঙ্গাব্দ, হিজরি তিনরকমের বছরেরই হিসাব দেওয়া থাকে।

মহাশ্বেতা রায়
পাটুলী, কলকাতা

ছবিঃ
উইকিপিডিয়া
বিসিএকলম্বাস

ছড়া-কবিতা

বলতে পারিস

চন্ডীতলার চন্ডীচরণ
বলল ডেকে হরেন কে
বলতে পারিস মনুমেন্টের
চূড়ায় প্রথম চড়েন কে?

গড়ের মাঠটা হাঁটতে হাঁটতে
পেরিয়েছিল প্রথম যে
কি নাম ছিল বলতো দেখি
কোন গ্রামেতে থাকতো সে?

চুলকে মাথা হরেন শেষে
খাঁকরে গলা পঁচিশ বার
পেলুম নাতো শুনতে ভালো
বলুন দেখি আরেক বার।

এই না শুনে উঠল জ্বলে
চন্ডী তেলে বেগুনে
হরেন বেটা হাসছে দেখে
ঘি পড়ল আগুনে।

বলতো দেখি শিয়ালদাতে
শেষ শিয়ালের ডাক শুনে
কোন সনে কে ফিরতো বাড়ি
বলতে পারিস দিন গুনে?

জানিস না তো কোন সে গাছ
ডানকুনির ঐ ডান কোনে
দাঁড়িয়ে ছিল শতেক বছর
একলা একা আনমনে।

জানতে গেলে পড়তে হবে
জানা অজানার আজব বই
পকেট থেকে দশটি টাকা
বার করলেই মিলবে সই।

পকেট থেকে দশটি টাকা
বার করতো ঝট্‌ করে
জানিস না তো কিচ্ছুটি ভাই
নে জেনে নে বই পড়ে।

শুভ্রজিত চক্রবর্তী
বালি, হাওড়া

কপোলার্থ

বাংলা পড়ান শম্ভুবাবু
সাহিত্য ও ভাষা;
এমনি রাশভারি তিনি
যায় না ক্লাসে হাসা।
সেদিন হটাত বলেন এসে --
বলতো দেখি হীরে
'কপোলেতে অশ্রু ঝরে'
--এর মানেটা কীরে?
হীরু নামের ডাকসাইটে
ছেলেও গেল চমকে
'কপাল ভাসে চোখের জলে'
বলেই গেল থমকে।
শম্ভুবাবু চটে বলেন-
বলিস যা তা কী যে
কপাল থাকে চোখের উপর
কেমনে তাহা ভেজে!
হীরু তখন বললো ভয়ে ভয়ে
বাঁধা পায়ে ঝুলছিল সে
তাইতো তাহার কপাল ভেজে
বলেই ফেলে মুচকি হেসে!

জামাল ভড়
বারাসাত
উত্তর চব্বিশ পরগনা

গল্প-স্বল্প

ইস্কুলে ভূত

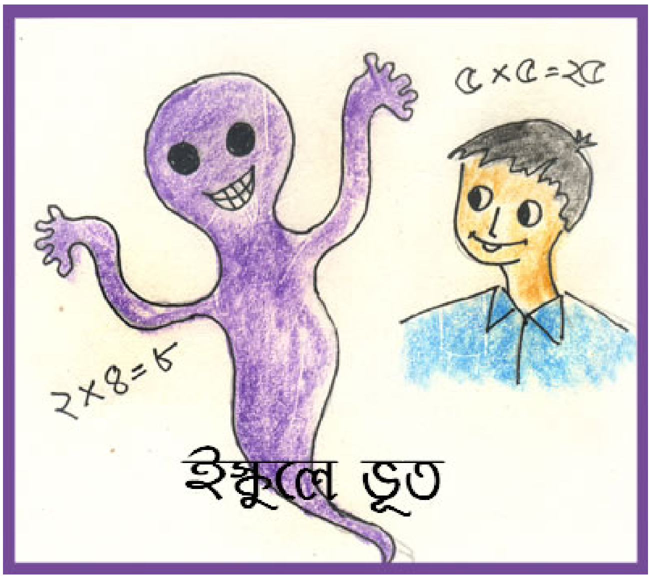

১

আকাশ কালো করে মেঘ জমেছে। চারিদিক অন্ধকার। ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। স্কুলের মাঠটায় জল দাঁড়িয়ে গেছে। গাছের শুকনো পাতাগুলো ভেসে ভেসে চলেছে। কাল ছোটকা কাগজ দিয়ে যে নৌকাটা বানিয়ে দিয়েছিল সেটা প্যান্টের ডান দিকের পকেটে রাখা আছে। একবার জলে ভাসিয়ে দিতে পারলে যা দারুন ভেসে ভেসে যাবে। ভাবতেই আনন্দ লাগছে সমুর।

- 'সমু, কী প্রশ্ন করেছি? উঠে দাঁড়াও।'

মাস্টারমশাই-এর গম্ভীর গলা। সমু থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়ায়।

- 'জানলার বাইরে কী দেখছিলে? '

- 'কিছু দেখিনি। না মানে বৃষ্টি পড়ছে, তাই দেখছিলাম।'

- 'ছয়ের ঘরের নামতা মুখস্থ হয়েছে? ছ সাততে কতো হয়? '

- 'ছ সাততে ছেচল্লিশ।'

- 'ছ সাততে ছেচল্লিশ? যাও ক্লাসের বাইরে যাও। বাইরে গিয়ে যত খুশী বৃষ্টি দেখ। পড়াশোনা করার কোন দরকার নেই তোমার।'

মাথা নিচু করে ক্লাসের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় সমু। মনটা খারাপ হয়ে যায়। প্রায় রোজদিন ওকে মাস্টারমশাই ক্লাসের বাইরে বার করে দেয়। বাবা জানতে পারলে খুব বকবে। কী যে করা যায়। কেন যে রোজ রোজ অন্যমনস্ক হয়ে যায় সমু। ছোটকার ওপর খুব একচোট রাগ হয়। কাল যদি ছোটকা

নৌকাটা না বানিয়ে দিত তাহলে আজ কিছুতেই বৃষ্টি দেখেই ওর নৌকার কথা মনে হত না। আর নৌকার কথা মনে না এলে ও কিছুতেই অন্যমনস্ক হত না। আর অন্যমনস্ক না হলে ওকে ক্লাসের বাইরেও বেরতে হত না। যত গন্ডগোল ঐ ছোটকাটার জন্যে।

বৃষ্টিটা যেন আরো জোরে এল। বৃষ্টির ছাট আসছে। বারান্দাটা বেশ সরু। সমু দেওয়ালের দিকে সরে গিয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ কেউ একটা ঠ্যালা মারে – 'সরে দাঁড়া। এটা আমার জায়গা।'

চারিদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলনা সমু। ভুল শুনেছে বোধহয়। আবার দেওয়ালের দিকে সরে দাঁড়াতে যায়। আবার একটা ধাক্কা। এই বার বেশ জোরে। ধাক্কা খেয়ে বারান্দায় পড়ে যায় সমু। খুব রাগ হয়ে যায়।

– 'কে মারছিস রে? সাহস থাকে তো সামনে আয়। ঘুঁসি মেরে নাক ভেঙ্গে দেব।'

– 'দেখতেই পায় না আবার মারবে। এই দিকটা আমার জায়গা। তুই তোর জায়গায় দাঁড়া। একদম আসবি না এদিকে।'

যেন ভেংচি কাটে ছেলেটা। দেখতে সত্যিই পাচ্ছে না সমু কিন্তু দিব্যি সব কথা শুনতে পাচ্ছে।

– 'কোন জায়গাটা তোর?'

– 'তোদের ক্লাস রুমের পাশের এই ঘরটা আমাদের। ঘরের সামনের জায়গাটাও আমাদের।'

সমু ভালো করে তাকিয়ে দেখে ঘরটা। ওদের ক্লাসরুমের পাশের ঘরটা সবসময় তালাবন্ধ থাকে। ভাঙ্গা চেয়ার টেবিল বেঞ্চি সব গাদা করে রাখা আছে ঘরটায়। ধুলো, নোংরা আর মাকড়সার জাল ভর্তি। কোনো দিন কেউ এই ঘরটা খোলে না, পরিস্কার করেনা। খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে

– 'এই ঘরটায় তুই থাকিস নাকি?'

– 'না, এখানে থাকব কেন? আমি থাকি সিং পাড়ায়। এটা আমাদের ইস্কুল।'

– 'ইস্কুল? কোন ক্লাসে পড়িস তুই?'

– 'দোকান ক্লাস।'

– 'সে আবার কী ক্লাস? আমি যেমন ক্লাস টু-তে পড়ি তুই তেমন কোন ক্লাসে পড়িস?'

– 'আঃ বললাম তো দোকান ক্লাস। আমাদের ক্লাসের এই রকমই নাম।'

– 'কী মজার নাম রে তোদের ক্লাসের। কিন্তু তুই ক্লাসের বাইরে কেন?'

– 'কেন আবার? যে জন্যে তুই ক্লাসের বাইরে সেই জন্যেই। অংক পারিনি বলে মাষ্টারমশাই আমাকে ক্লাসের বাইরে বার করে দিয়েছে। সেই কখন থেকে মাথা নিচে করে পা ওপরে তুলে বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলের ওপর ব্যালেন্স করে দাঁড়িয়ে আছি। আঙ্গুল ব্যাথা হয়ে গেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।'

– 'কই কোথায় দাঁড়িয়ে আছিস? তোকে দেখতে পাচ্ছিনা কেন বলতো?'

- 'আমি ভূত তো। তাই।'

- 'ভূতদের দেখা যায়না কেনরে?'

- 'দেখা যায়। তবে আমরা মানুষদের দেখা দিই না। মানুষরা আমাদের দেখলে বড্ড ভয় পায়।'

- 'ভয় পায় কেন? ভুতেরা দেখতে খুব বিচ্ছিরি হয় বলে?'

- 'না না। সে অনেক ব্যাপার তুই বুঝবি না। আসলে ভূতে আর মানুষে বন্ধু হয়না তো তাই।'

- 'কেন হবে না কেন? এই তো তোকে আমি দেখিনি কিন্তু তাও তোকে আমার কেমন বন্ধু বন্ধু মনে হচ্ছে।'

- 'হ্যাঁ আমারও অবশ্য তোকে বেশ বন্ধু বন্ধু লাগছে। মনে হচ্ছে তোর কাছে আমি দেখা দিতে পারি। তবে এখানে নয়। এখানে অন্য ছেলেরা আমাকে দেখে ফেললে অসুবিধে হয়ে যাবে। তুই আমাদের ক্লাসে চল।'

- 'দরজায় তো তালা লাগানো। যাব কি করে?'

সমু পাশের ঘরের দিকে তাকায়। হঠাৎ দেখে তালা লাগানো দরজাটা ম্যাজিকের মতো খুলে গেল। ভেতরটা বেশ অন্ধকার। সমুর ঢুকতে একটু অস্বস্তি করছিল। কিন্তু এমন ঠ্যালা খেল পেছন থেকে যে কিছু বোঝার আগেই সে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে ঘরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

সমু দেখল ঘরের মধ্যে সারি সারি নানা রঙের বেঞ্চি পাতা। বেঞ্চির এমন লাল নীল সবুজ রঙ কোনদিন দেখেনি সমু। সেখানে অদ্ভুত দেখতে নানা সাইজের ভূতেরা পা ঝুলিয়ে বসে কোলের ওপর স্লেট পেনসিল নিয়ে অংক কষছে। সামনের ব্ল্যাক বোর্ডে গুন ভাগের কিছু অংক দেওয়া আছে।

ওকে দেখা মাত্রই সবাই খুব চমকে গেল। তারপর ভোজবাজীর মতো সবাই উধাও হয়ে গেল। একমাত্র ওর বন্ধু ভূতটা পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সমু তাকে জিজ্ঞেস করল - 'সবাই পালালো কেন রে?'

- 'পালাবে কেন? তোকে দেখে অদৃশ্য হয়ে গেছে।'

- 'ওঃ আচ্ছা। আমাকে দেখে ভয় পেয়ে গেছে বুঝি।'

- 'না, না। ভূতেরা মানুষদের ভয় পায় না। মানুষরাই ভূতেদের ভয় পায়।'

- 'দ্যাখ ভূত, এই তো তুই আমার পাশেই একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছিস। কই আমার তো ভয় লাগছে না।'

- 'এই খবরদার আমায় ভূত বলে ডাকবি না। আমার নাম তিড়িং।'

'তিড়িং' নাম শুনে এমন হাসি পেল সমুর যে পাক্কা তিন মিনিট হেসেই চলল। হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল, পেট ব্যাথা হয়ে গেল। হাসতে হাসতে বসেই পড়ল ভূতেদের বেঞ্চিতে। আর যেই না বসা সঙ্গে সঙ্গে ঠ্যালা খেয়ে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। তাতে এমন চমকে গেল সমু যে সঙ্গে সঙ্গে

তার হাসি বন্ধ হয়ে গেল।

- 'এই কে আমায় ঠ্যালা মারলি রে?

বলতেই দেখে ঘর ভরতি ভূত সবাই ফিরে এসেছে। একজন এগিয়ে এসে বলল

- 'আমি ঠ্যালা মেরেছি। তুই আমার গায়ের ওপর বসে পড়েছিলি কেন? ভূত বলে কি আমার গায়ে লাগে না?'

- 'তা দেখতে না পেলে কী করব। তোরা আমাকে দেখেই সবাই হাওয়া হয়ে গেলি যেমন। আমি কি তোদের দেখে ভয় পেয়েছিলাম নাকি? আচ্ছা, তোর নাম কি রে?'

- 'আমার নাম বিড়িং।'

তিড়িং বিড়িং... কী মজার নাম রে সব ভূতেদের। আবার এমন হাসি পেল সমুর যে আবার পাক্কা তিন মিনিট হেসেই চলল। হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল, পেট ব্যাথা হয়ে গেল। হাসতে হাসতে বসেই পড়ল মেঝেতে। অবাক হয়ে বিড়িং জিগ্যেস করল - 'এত হাসি পাচ্ছে কেন তোর?'

- 'তোদের নাম শুনে। তিড়িং বিড়িং এরকম আবার কারো নাম হয় নাকি?'

- 'হয় তো। আমাদের দোকান ক্লাসে সবার এরকমই নাম। পিড়িং সিড়িং চিড়িং কিড়িং মিড়িং নিড়িং...'

- 'থাক থাক আর নাম বলিস না। আমার আবার ভয়ানক হাসি পাচ্ছে।'

- 'শুধু শুধু এমন হাসি পায় কেন তোর? তোর সমু নাম শুনে তো আমরা হাসিনি। তাহলে তুই আমাদের নাম শুনে হাসছিস কেন? ভূত বলে কি আমাদের দুঃখ হয় না।' ভূতটা বুঝি দুঃখে কেঁদেই ফেলবে এইবার।

তাড়াতাড়ি সমু বলে - 'আচ্ছা আচ্ছা আমার ভুল হয়ে গেছে। আর হাসব না। তোদের অংকের মাস্টারমশাই কোথায় রে? দেখতে পাচ্ছি না তো।'

- 'এখন আমাদের প্র্যাকটিস টাইম। তাই মাস্টারমশাই বাড়ি চলে গেছে।'

- 'কিসের প্র্যাকটিস করবি?'

- 'অংক। মাস্টারমশাই পাঁচটা গুন আর পাঁচটা ভাগ দিয়ে গেছে। তিন ঘন্টা পরে এসে দেখবে। আমাদের পরীক্ষা তো সামনেই। তাই এখন আমাদের খুব পড়ার চাপ। আমরা সবাই এখন মন দিয়ে অংক কষব। তুই বরং তোর ক্লাসে চলে যা। নাহলে সবাই তোকে খুঁজবে।'

ঠিক তখনই ঢং ঢং করে ক্লাস শেষ হওয়ার ঘন্টা পড়ল। সমু ছুটে গিয়ে নিজের ক্লাস রুমের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পড়লো। মাস্টারমশাই বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। আর যাওয়ার সময় খুব কঠিন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন - 'পরের দিন যদি আবার এরকম হয় তাহলে বাড়িতে খবর পাঠানো হবে।'

২

বিকেলে স্কুল ছুটি হয়ে গেল। সমুর বাড়ি স্কুলের কাছেই। দশ মিনিটের হাঁটা রাস্তা। সমু রোজ হেঁটেই বাড়ি ফেরে। আজ স্কুল থেকে বেরিয়েই দেখল ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। গায়ে মাথায় কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তেই মন ভালো হয়ে গেল সমুর। ছাতা না খুলে ভিজতে ভিজতে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। রাস্তায় কোথাও জল জমে আছে দেখলে ভারী আনন্দ লাগছিল। যেন ছোট্ট একটা পুকুর। সেই পুকুরের ওপর দু'পা জড়ো করে ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ার একটা আলাদাই মজা। গুনে গুনে উনচল্লিশটা জমা জল খুঁজে বার করে তার একটাও বাদ না দিয়ে তাদের ওপর লাফিয়ে জল ছিটিয়ে কাদা ভূত হয়ে বাড়ি ফিরল সমু।

বাড়ি ফিরতেই মা-এর বকুনি – 'এই কাদা মাখা জামা জুতো সব আজ নিজে পরিস্কার করবে। মা করে দেবেনা। এইখানে সাবান রইল। বালতিতে জল রইল।'

এই তো ঝামেলা করে মা। মা কী ছোটবেলায় এরকম লাফাতো না? মা-এর জামা এরকম কাদা হত না? সমু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। ভাবে যদি একটা টাইম মেশিন থাকতো তো মায়ের ছোটবেলাটা ঠিক দেখে আসতো। তারপর দরকার মতো মাকে লিস্ট দিতো কবে কখন কী সব দুষ্টুমি মা করতো। তখন মা আর কিছুতেই ওকে বকতে পারত না। কিন্তু সেরকম কোন সুযোগ নেই। কিছুই সমুর মনের মত হয় না। বড় হলে একটা টাইম মেশিন আবিস্কার করতেই হবে। কিন্তু কবে যে বড় হবে সমু।

বই-এর ব্যাগ পড়ার টেবিলে রেখে জামাকাপড় ছেড়ে লক্ষ্মী ছেলের মত সব খাবার খেয়ে নিল সমু। তারপরে কাগজের নৌকাটা ভাসিয়ে দিল বাড়ির সামনের জমা জলে। নৌকাটা বেশ খানিক দূর ভেসে ভেসে গেল। কিন্তু একটু দূরে গিয়েই একটা বড় ইঁটের টুকরোতে আটকে আড় হয়ে গেল। সমু নৌকাটাকে ঠিক করার জন্যে জলে নামল। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চীৎকার – 'এক পাও আর জলে নামাবে না। অনেক ভিজেছ আজকে। আর বেশী ভিজলে নির্ঘাত জ্বর হবে।' এখন জলে না নেমে নৌকাটা কী করে ঠিক করা যায়। কী মুস্কিল যে করে মা। একটা বড় লাঠি পেলেও বা একটা উপায় হত।

– 'এই নাও এই লাঠিটা দিয়ে ঠিক করো নৌকাটা।'

একটা বড় লাঠি এগিয়ে দিলো কেউ। আরে এ যে সেই ভূতটা।

– 'আরে তিড়িং যে। তুই এখানে কোথা থেকে এলি?'

– 'আমি তোর সঙ্গে সঙ্গে এসেছি ইস্কুল থেকে। আমায় একটু অংক শিখিয়ে দিবি সমু?

– 'অংক? কিন্তু আমি তো নিজেই ভালো অংক জানিনা।'

– 'সে তো তুই মন দিস না বলে। আসলে তো তোর বুদ্ধি আছে। তুই ইচ্ছে করলেই অংক শিখে নিতে পারিস। কিন্তু আমি কিছুতেই অংকগুলো বুঝতে পারিনা।'

– 'না রে আমার বুদ্ধি নেই। আমি পরীক্ষাতে সব সময় অংকে খুব কম নম্বর পাই। বাবা বকে, মা

বকে, মাস্টারমশাই বকে।'

– 'আমার থেকে তোর বেশি বুদ্ধি। আমি দশ বছর ধরে দোকান ক্লাসে পড়ছি। আমায় দে না অংক শিখিয়ে। তুই যা বলবি আমি তোর জন্যে সব করে দেব। তুই শুধু আমায় দোকান ক্লাসটা পাস করিয়ে দে।

– 'তুই দশ বছর ধরে এই একই ক্লাসে আছিস?'

– 'হ্যাঁ তো। দু বছর গেল যোগ শিখতে। তিন বছর বিয়োগ। তিন বছর গুন। এই হল মোট সাত বছর।'

– 'সাত কোথায়? আট বছর হল তো। দুই আর তিনে পাঁচ। পাঁচ আর তিনে আট।'

– 'হ্যাঁ ঠিক। দেখেছিস তো তুই আমার থেকে কত ভালো অংক জানিস। আট বছর এইভাবে গেল। আচ্ছা সমু, দশ থেকে আট বাদ দিলে কত থাকে রে?'

– 'দুই।'

– 'হ্যাঁ, ঐ দু বছর ধরে ভাগ শেখার চেষ্টা করছি। কিন্তু কিছুতেই শিখতে পারছি না। তার ওপর মাঝে মাঝেই যোগ বিয়োগও ভুল করে ফেলি। যেমন এক্ষুনি ভুল করে ফেললাম। এই বছর না পাস করতে পারলে আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে রে।'

– 'তাই নাকি? কেন কেন?'

– 'দশ বছরে দোকান ক্লাস পাস না করলে দোকানে বসতে দেবেনা আমায়। আমায় বেকার ভূত হয়ে জীবন কাটাতে হবে। আমার কবে থেকে শখ একটা বলের দোকান করার। দোকানি হওয়াই আমার ভূত জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।'

– 'বলের দোকান করবি তুই? ভূতেরাও বল খেলতে ভালোবাসে বুঝি?'

– 'হ্যাঁ খুব ভালোবাসে। কত রঙের, কত রকমের বল পাওয়া যায়। কিছু বল আছে যেগুলো হাওয়ায় ঘুড়ির মত ভেসে থাকতে পারে। আকাশে উড়ে উড়ে আমরা সেই বল দিয়ে খেলি। আমি দোকানি হলে তোকে সেই বল দেবো একটা।'

– 'দিবি তো? মনে থাকে যেন।'

– 'মনে থাকবে ঠিক। আচ্ছা সমু তুই কি হতে চাস রে?'

– 'কী জানি। আমার একেক সময় একেক রকম হতে ইচ্ছে করে। মাথাটা গুলিয়ে যায়। তাই মা বলেছে বড় হয়ে ভাবতে। তবে আমার কদিন ধরে মনে হচ্ছে আমি বড় হয়ে ঠিক একটা টাইম মেশিন বানাবো।'

– 'টাইম মেশিনটা কি জিনিস?'

– 'এটা একটা যন্ত্র যাতে চেপে আমি দেখে আসতে পারি আমার মা বাবার ছোটবেলা। বাবা, মা

কেমন দুষ্টুমি করত সব জেনে যেতে পারব। আর জেনে যেতে পারব যে মা পেঁপে আর উচ্ছে খেতে ভালোবাসত কিনা। বাবার সন্ধ্যে বেলা পড়তে বসলে ঘুম পেত কিনা।'

- 'আচ্ছা। সে তো দারুন যন্ত্র রে।'

- 'হ্যাঁ, দারুন।'

- 'তাহলে কী ঠিক করলি তুই? আমাকে অংক শেখাবি তো? আমি তোর সব কাজ করে দেব। যা যা বলবি সব। টাইম মেশিন বানাতে পারব না অবশ্য। এছাড়া সব পারব। যেমন তোর বই গুছিয়ে দেওয়া, তোর জুতো পালিশ করে দেওয়া, তোকে ঘুম থেকে রোজ ডেকে দেওয়া।'

- 'আচ্ছা দেখি পরীক্ষা করে পারিস কিনা। যা তো আমার কাদা জামাটা ধুয়ে পরিস্কার করে দে তো দেখি।'

সঙ্গে সঙ্গে তিড়িং গিয়ে এক মিনিটের মধ্যে জামা কেচে ধুয়ে সুন্দর করে তারে মিলে দিয়ে এসে বসলো সমুর পাশে। সমু তো হাঁ হয়ে গেল দেখে।

তিড়িং এসেই বলল – 'বল আর কি কাজ করে দিতে হবে।'

- 'আমার পেনসিল বক্সে পেনসিলগুলো সব ভোঁতা হয়ে গেছে। দে তো সার্প করে।'
তাও কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হয়ে গেল। তখন সমু তিড়িংকে বলল

- 'আচ্ছা আমি কাল থেকে তোকে অংক শেখাবো। কিন্তু তোকে রোজ এসে আমার বিছানা গুছিয়ে দিতে হবে, স্কুলের জামাকাপড়ও পাট করে গুছিয়ে রাখতে হবে। রুটিন দেখে স্কুলের বই ব্যাগে পুরে দিতে হবে। পেন্সিল সার্প করে দিতে হবে। সকালে মা ডাকার আগেই ঘুম থেকে ডেকে দিতে হবে। আর ক্লাসে আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেল আমাকে অল্প ঠ্যালা মেরে মনে করিয়ে দিতে হবে। সব মনে করে করতে পারবি তো? ভুলে গেলে চলবে না। তুই বরং একটা কাগজে লিখে রাখ।'

- 'লিখে রাখতে হবে না। সব মনে থাকবে। এ আর এমন কি কাজ হল?'

- 'কিন্তু তোকে অংক শেখাবো কখন?'

- 'কেন? বিকেলে যখন তুই খেলিস তখন।'

- 'আচ্ছা। ঠিক আছে।'

তিড়িং চলে গেল বাড়ি।

এতো বৃষ্টিতে তো আজ বাইরে খেলতে যাওয়া যাবে না। নৌকাটাও ভেসে ভেসে কোথায় চলে গেছে চোখে পড়ছে না। সমু মা কে ডেকে বলল – 'আমাকে অংক দাও তো মা। একটু অংক কষি।'
মা শুনে তো আকাশ থেকে পড়লেন – 'আজ ছেলের আমার খুব সুমতি যে নিজে নিজে অংক কষতে চাইছে। ব্যাপারটা কী? সূর্য আজ কোন দিকে উঠেছে?'

- 'মা, আজ সূর্য ওঠেনি সকাল থেকে। দেখছ না কেমন মেঘলা আকাশ। আমাকে অনেক বেশি করে

অংক দাও আজকে। যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ সব। শুধু একটা কথা আমি ভুল করলে আমাকে বকা চলবে না। তুমি বুঝিয়ে দেবে। দেখবে আমি কেমন সব বুঝে যাব। আজ খুব মন দিয়ে শুনবো। একটুও অন্যমনস্ক হব না।'

- 'আচ্ছা তাই হবে। এমন ভালো ছেলে হয়েছিস আজ। আমি একটুও বকব না।'

মা-এর সঙ্গে বসে বসে অনেক অংক প্র্যাকটিস করে ফেলল সমু। খুব মন দিয়ে সব বুঝে নিল। মনে মনে খুব উত্তেজনা লাগছে। কাল থেকে আবার তিড়িংকে মাস্টারমশাই-এর মত অংক শেখাতে হবে।

৩

পরদিন সকাল সকাল তিড়িং এসে ঘুম থেকে ডেকে দিল। ওর ব্রাশে পেস্টও লাগিয়ে দিল। সমু যখন দাঁত মাজতে গেল তখন মা সমুকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে গেল – 'আরে তুই এত সকালে?'

- 'ঘুম ভেঙ্গে গেল।'

- 'এত তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙ্গে গেল? শরীর ভালো আছে তো তোর?'

বই পত্র সব রুটিন দেখে গুছিয়ে দিল তিড়িং। একটা বই-এর মলাট ছিঁড়ে গিয়েছিল সেটায় নতুন মলাটও করে দিল। কিন্তু ওর হাতের লেখা খারাপ বলে নাম লিখে দিল না। সমুর হাতের লেখা খুব ভালো। ও নিজেই সুন্দর করে নিজের নাম, বই-এর নাম, ক্লাস সব লিখে নিল। স্কুলে যাওয়ার সময় জামা জুতো পরতেও সাহায্য করল তিড়িং। সবই অবশ্য অদৃশ্য হয়ে করছিল যাতে কেউ ওকে দেখে না ফেলে।

স্কুলে আজ সব ক্লাসে খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করেছে সমু। অন্যমনস্ক হলেই তিড়িং ওর মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিচ্ছিল। অংকের ক্লাসে সব অংক পেরেছে বলে মাষ্টার মশাই খুব অবাক হয়ে গেছে। একটুও বকেনি বরং খুব ভালোবেসে পিঠ চাপড়ে দিয়েছে। বলেছে – 'এই তো চাই। রোজ রোজ তোকে এরকম মন দিয়ে ক্লাসে পড়া শুনতে হবে আর এরকম তাড়াতাড়ি অংক কষে ফেলতে হবে। মন দিলেই তুই পারবি।'

স্কুল থেকে ফিরেই মাঠে গেল সমু। তিড়িং ও স্লেট পেনসিল নিয়ে এসে গেল। আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার। কিন্তু মাঠে জল জমে আছে আর বিস্তর কাদা। তাই বল খেলতে নামেনি কেউ। সমু অনেকগুলো যোগ করতে দিল তিড়িং কে। তিড়িং না পারলে সব বুঝিয়ে দিল ভালো করে। কুড়িটা অংক করার পর তিড়িং কে ছুটি দিয়ে দিল। তারপর দুজনে একটা ছোট নিচু পেয়ারা গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে বসে অনেক গল্প করল।

এই ভাবে দু সপ্তাহের মধ্যেই সমু যোগ আর বিয়োগ শিখিয়ে ফেলল তিড়িং কে। তিড়িংকে এখন যোগ, বিয়োগ যা দিচ্ছে সে নিমেষে করে ফেলছে। ছোট ছোট যোগ বিয়োগ দিলে স্লেটে না লিখে মুখে মুখেই করে ফেলছে। আর ওকে শেখাতে গিয়ে সমুও অংকে এমন ভালো হয়ে গেছে যে স্কুলে হঠাৎ মাস্টারমশাই ওকে খুব ভালোবাসতে শুরু করেছে। এমন কি ক্লাসের বন্ধুরাও যেন ওকে একটু সমীহ

করে চলছে।

পরের সপ্তাহ থেকে গুন আর ভাগ শেখাতে হবে তিড়িং কে। হাতে আর বেশী সময় নেই। রোজ সন্ধ্যেবেলা স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে বাড়িতে মায়ের কাছে মন দিয়ে গুন আর ভাগ প্র্যাকটিস করে সমু।

৪

রবিবার দুপুরে বাবা ঘুমাচ্ছিল। মা কাগজ পড়ছিল। সমু কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। শেষে হাতে একটা গল্পের বই নিয়ে ছাদে ঘুরতে গেল। হঠাৎ দেখে তিড়িং আর তার একটা বন্ধু ভূত ছাদের কার্নিসে পা ঝুলিয়ে বসে আছে।

- 'আরে তিড়িং তুই এখন এখানে কেন? আজ তো রবিবার। আমার ছুটি। তোরও ছুটি।'

- 'সমু তুই আমাকে যেমন অংক শেখাচ্ছিস তেমন একেও একটু ইংরেজীটা শিখিয়ে দে না।'

- 'এ তোর বন্ধু? তোর নাম কী রে?'

সেই ভূতটা বলল – 'আমার নাম চিচিং।'

- 'তুই তিড়িং-এর সঙ্গে পড়িস?'

- 'না, আমি খবর ক্লাসে পড়ি।'

- 'সেটা আবার কী ক্লাস?'

- 'এই ক্লাসটা পাস করলে আমি সাংবাদিকের কাজ পাব। নানা দেশ ঘুরে ঘুরে সব দেশের ভূতেদের খবর সংগ্রহ করে আনব। সে গুলো ছেপে কাগজে বেরবে।'

- 'তাই নাকি? সে তো দারুন ব্যাপার। কিন্তু তুই কি দোকান ক্লাস পাস করে গেছিস?'

- 'না না আমাদের দোকান ক্লাস পড়তে হয় না।'

- 'তিড়িং যে পড়েছে?'

- 'তিড়িংকে তো পড়তেই হবে। ও তো দোকানি হতে চায়। দোকানিদের জিনিষপত্র বিক্রী করে টাকা পয়সার হিসেব রাখতে হবে তো। তাই যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ না জানলে চলবে না। কিন্তু আমি তো শুধু খবর লিখবো। তার জন্যে বাংলা আর ইংরেজীটা ভালো করে শিখতে হবে। আমি বাংলাটা ভালো জানি। কিন্তু শুধু বাংলা জানলে আমি বিদেশে যেতে পাবো না। বিদেশে যেতে হলে ইংরেজীটাও জানতে হবে।'

- 'ইংরেজী জানতে হবে কেন?'

- 'বাঃ রে বিদেশের ভূতরা কি আর বাংলা বলতে পারে। ইংরেজী না বললে তারা কিছু বুঝবেই না।

আমার ভূত জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বিদেশ যাওয়া। তুই একটু আমায় ইংরেজী শিখিয়ে দে। যতদিন আমি এ দেশে আছি তুই যা বলবি আমি সব করে দেব।'

- 'আচ্ছা শিখিয়ে দেব। কিন্তু তার আগে দেখি কী করে দিতে পারিস তুই। কিছু করে দেখা আমায়।'

- 'কী করা যায় তোর জন্যে? আচ্ছা, তুই কি ফল খেতে ভালোবাসিস?

- 'পাকা কুল, আতা, খেজুর, জামরুল।'

সঙ্গে সঙ্গে ভ্যানিস করে গেল চিচিং। আর এক মিনিটের মধ্যে কলাপাতার মধ্যে মুড়ে এক থোকা কুল, গোটা দশেক খেজুর, পাঁচটা জামরুল আর দুটো পাকা আতা নিয়ে হাজির। সমু তো তাজ্জব।

- 'কোথা থেকে আনলি এসব? কার গাছ থেকে পেড়ে আনলি? সে আবার আমায় ধরে মারবে না তো?'

- 'আরে না না। আমি তো সব জঙ্গলের গাছ থেকে তুলে এনে দিলাম। তুই যা খেতে চাইবি আমি তোকে সব খাওয়াতে পারব।'

- 'আইসক্রীম খাওয়াতে পারবি রোজ বিকেলে? তাহলে আমি পাক্কা তোকে ইংরেজী শিখিয়ে দেব।'

- 'এটা কোন ব্যাপার হল? আমি আইসক্রীম-এর কারখানা থেকে একটা করে আইসক্রীম নিয়ে আসব রোজ। একেক দিন একেক রকম। কিন্তু রোজ আইসক্রীম খেলে তোর ঠান্ডা লাগবে না তো? তাহলে আবার মায়ের কাছে বকুনি খাবি।'

- 'হ্যাঁ। এইটা একটা মুস্কিল। তাহলে বরং তুই জঙ্গল থেকে রোজ দু রকমের গাছ পাকা ফলই তুলে আনিস।'

- 'ঠিক আছে। তাহলে কাল থেকে আমায় ইংরেজী পড়াবি তো?

- 'হ্যাঁ পড়াব। আমি যা জানি তোকে সব শিখিয়ে দেব। এমন শিখিয়ে দেব যে তুই গড় গড় করে আমার ইংরেজী বই পড়ে ফেলতে পারবি।'

চিচিং আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে।

পরের সপ্তাহটা খুব খাটুনি গেল সমুর। রোজ রোজ তিড়িং কে অংক শেখানো। গুন আর ভাগ শেখাতে খুব পরিশ্রম হল। নামতা মুখস্থ করাতে গিয়ে তো ঘেমে গেল সমু। তিড়িং-এর যা বুদ্ধি সে আর বলার নয়। অনেক বার রেগে যেতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে।

চিচিং তাও একটু ভালো। তাড়াতাড়ি শিখে নিয়েছে। সমুর কাছে পড়ে গিয়ে আবার বাড়িতেও অনেক পড়েছে। তাতেও মাঝে মাঝেই উচ্চারন ভুল করত। একই জিনিষ বার বার ভুল করছে দেখলে সমু মাঝে মাঝে রেগে যেত। কিন্তু চিচিং এত বুদ্ধিমান যে সমু রেগে গেলেই ওকে একটা আইসক্রীম এনে দিত। আর আইসক্রীম দেখলে কি আর রেগে থাকা যায় নাকি?

৫

সেই বছর সমু পরীক্ষায় দারুন রেজাল্ট করল। অংকে একশোতে একশো, ইংরেজীতে নব্বই। বাকী সব বিষয়েই অনেক ভালো করেছে। বাবা, মা ওর নম্বর দেখে খুব খুশি। পরদিনই একটা নতুন ক্রিকেট ব্যাট আর বল এনে দিয়েছে বাবা। আর মা একটা গল্পের বই দিয়েছে – 'ভূতেরা চাউমিন খেতে ভালোবাসে।'

এপাশে চিচিং খুব ভালো নম্বর পেয়ে খবর ক্লাস পাস করে সাংবাদিক হয়ে ইউরোপ চলে গেছে। তার লেখা কাগজে মাঝে মাঝে বেরোয়। বেরোলেই তিড়িং এসে সমুকে কাগজটা পড়তে দিয়ে যায়। সে এক অদ্ভুত ধরনের কাগজ। দিনের বেলা কোন লেখা দেখা যায় না। রাত্রিবেলা অন্ধকারের মধ্যে কাগজটা খুললে নানা রঙ-চঙ্গে লেখা আর ছবি নজরে পড়ে। সে সব দুর্ধষ খবর। পড়তে পড়তে সমুও মনে মনে ইউরোপ ঘুরে ফেলে। তিড়িং তো ইংরেজী পড়তে পারে না। তাই সমু রাত্রে সব খবর পড়ে নেয়। পরদিন তিড়িং কাগজ ফেরত নিতে এলে ওকে বাংলায় সব বলে দেয়।

তিড়িংও খুব ভালো ভাবে পাস করে গেছে দোকান ক্লাস। সিং পাড়ায় একটা ভাঙ্গাচোরা পোড়ো বাড়ি আছে যেখানে কোন মানুষ থাকে না। বাড়িটার চারিদিকে বট অশ্বত্থ গাছ গজিয়ে ছেয়ে ফেলেছে। সেই বাড়িটার দোতলায় একটা বিশাল ঘরে তিড়িং-এর বলের দোকান। সমুর বল হারিয়ে গেলেই সমুকে ফ্রীতে একটা করে বল দেয় তিড়িং।

এখন সমু নিজের কাজ সব নিজে করে নেয়। তিড়িংকে আসতে বারন করে দিয়েছে। বাবা মা আর একটুও বকে না ওকে। এখন ওকে ক্লাসেও সবাই খুব ভালো ছেলে বলে। মাস্টারমশাইরাও খুব ভালোবাসেন। ও তো জেনে গেছে যে একটু মন দিয়ে পড়লেই আর একটু বেশী করে প্র্যাকটিস করলেই সব বিষয়ে ভালো নম্বর পাওয়া যায়।

রুচিরা
বেইজিং, চীন

<u>ইচ্ছে মতন: জগন্নাথধামে কয়েকদিন</u>

২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসের ২০-২৫ তারিখ পাঁচ দিনের জন্য আমরা পুরি গিয়েছিলাম। আমাদের এই জার্নি ছিল, হাওড়া থেকে পুরি। তাই ১৯ তারিখ রাত ১০টা ৩৫মিনিটের পুরি এক্সপ্রেসে চেপে আমরা পুরির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পরদিন ভোরবেলা,চারিদিক প্রচন্ড কুয়াশা,দূরের কিছু দেখা যাচ্ছে না।

সকালের কুয়াশায় ঢাকা চারিদিক

সকাল ৭টা ৫০ নাগাত পুরি স্টেশনে এসে ট্রেন থামল। স্টেশন থেকে সোজা অটো করে এলাম সমুদ্রের ঠিক সামনে'স্বপ্নপুরি'হোটেলে। অসংখ্য মানুষ সমুদ্রে আনন্দ করে স্নান করছে। আরও দেখলাম সমুদ্রের ধারে পড়ে থাকা মৃত কচ্ছপের দেহ। শুনলাম এইরকম ভাবে আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হচ্ছে বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষয় কেউ এদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

বালিতে মরে পড়ে আছে বিরল প্রজাতির কচ্ছপ

পরদিন সকালবেলা গেলাম জগন্নাথ দেবের মন্দিরে। হোটেল থেকে মন্দির হাঁটা পথ। মন্দিরের ভিতরে প্রচন্ড ভীড়!অসংখ্য মানুষ জগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে পুজো দিচ্ছে। মন্দিরের ভিতর ভোগের বাজারে ভোগ বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া দেখলাম ভোগ তৈরীর ঘর। ঘর ঘেরা থাকলেও ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে,অনেক লোক কাঠের জ্বালে রান্না করছে। মন্দির দর্শন করা ও পুজো দেওয়ার পর আমরা হোটেলে এলাম। পরদিন সকাল ১১টা নাগাত চিল্কা পৌঁছলাম।

চিল্কা হ্রদ

পুরো চিল্কা হ্রদটা নৌকা করে ঘুরলাম। প্রথমে এলাম ডলফিন পয়েন্টে,পুরো ডলফিন দেখতে না

পারলেও ডলফিনের মাথা,লেজ,ডানা বেশ ভালো ভাবে দেখেছি। শুনেছি ওরা ভিষণ লাজুক আর ভিতুও। তবে আমাদের নৌকার খুব কাছেই ওরা ছিল। নিজেদের মতো করে জলের মধ্যে ডুব দিচ্ছিলো আর উঠছিলো। এছাড়া দেখলাম নানা রকমের,নানা রঙের অসাধারণ দেখতে বিদেশী পাখী। ওখান থেকে নৌকা করে'সী মাউথ'দেখতে এলাম।

সী মাউথ

এখানে চিল্কা হ্রদের সাথে বঙ্গোপসাগরের মিলন হয়েছে। কিছুক্ষণ পর ওখান থেকে নৌকা করে ফিরে এলাম। বিকেল ৪টে নাগাত আমরা হোটেলে ফিরলাম। পরদিন বিকেলবেলা কোনারকের সূর্য মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সন্ধ্যাবেলা কোনারকের লাইটিং দেখার মত!

কোনার্ক এর সূর্যমন্দির

ওখানে সূর্যদেবের রথের চাকা দেখলাম,আগে এই চাকার সাহায্যে সময় নির্ণয় করা হত।

রথের চাকা, যা আসলে সূর্যঘড়ি

কোনারকের মূল মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকলেও বাইরে থেকে মন্দিরটা দেখলাম। কোনারকের সূর্য মন্দির এককথায় অসাধারণ। ৭টা নাগাত ওখান থেকে রওনা দিলাম। ফেরার পথে বারবার মনে হচ্ছিল গাইডের কথা গুলো। বহুকাল আগে এরকমই এক সন্ধ্যেবেলা মন্দিরে আরতি হত। অনেক লোক আসতেন, পুজো দিতেন, অনেক ভোগ দেওয়া হত। মন্দিরের চারপাশ ভরে থাকতো ধূপ-ধুনো আর ফুলের গন্ধে।

পরদিন জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি,পিসির বাড়ি,মা চন্ডীর মন্দির,সোনার গৌরাঙ্গের মন্দির দেখতে গেলাম।

জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ি

আর কি খেলাম? পুরিতে খাজার জন্য বিখ্যাত দোকান কাকাতুয়াতে গিয়ে রোজ ভরপেট খাজা, কচুরী, সিঙ্গারা, রাবড়ি খেতাম।

কাকাতুয়ার খাজা

আর দুপুরে বেনফিসে গিয়ে পমপ্লেট মাছ, ঝুরো আলুভাজা, চিংড়ি তো থাকতোই। সমুদ্রের ধারে বসে রোজ বিকেলে খেতাম বাদামভাজা, ঝালমুড়ি আর সকালে সূর্যোদয় দেখতে দেখতে চা। পুরীর মন্দিরে শ্রী শ্রী জগন্নাথের প্রসাদও দারুন খেতে। আমার আবার ইচ্ছে আছে পুরী যাওয়ার। তখন বাকি জায়গা গুলো ঘুরবো আর ফিরে এসে ইচ্ছামতীতে লিখবো।

সোহিনী মৈত্র
সপ্তম শ্রেণী
হোলি চাইল্ড ইনস্টিটিউট, কলকাতা

তুমি কি সোহিনীর মত "ইচ্ছে মতন" বিভাগে তোমার লেখা দিতে চাও? তাহলে তোমার ইচ্ছে মতন লেখা গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী - যা ইচ্ছে লিখে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে।

আনমনে: আমার ছোট্টবেলাঃপর্ব ৩

পর্ব তিন

শীতের দুপুরে পাঠশালা থেকে ফিরে কোন কোন দিন দেখতাম 'মলন' দেওয়া হচ্ছে। উঠোনের মধ্যে বৃত্তাকারে ধানশুদ্ধ গাছগুলোকে উঁচু করে সাজিয়ে ফেলা হত। তারপর এর ওপর দিয়ে একজোড়া বলদ হাঁটানো হত। এর নামই 'মলন' দেওয়া।

কেন দেওয়া হত বলতো? তখন তো গ্রামের দিকে গাছ (খড়) থেকে ধান ছাড়ানোর মেশিন ছিল না। তাই এই পদ্ধতি। ক্রমাগত হাঁটার ফলে বলদের পায়ের চাপের গাছ থেকে ধান আলাদা হয়ে তলায় পড়ে যেত। এর পর ওপর থেকে খড় ঝেড়ে তুললেই হল। হাঁটার সময় গরুদের মখে দড়ির তৈরি জাল এঁটে দেওয়া হত যাতে ধানে মুখ দিয়ে কাজে ফাঁকি না দেয়।

খড় ঝেড়ে তোলার পর উঠোনে যে ধান পড়ে থাকত তাতে অনেক খড়ের টুকরো থাকত। কি বলে এগুলোকে? কুড়ো বলে বোধ হয়!

পরে এইসব টুকরো বা কুড়ো গুলোকে ঝাড়তে হত। তারও আবার একটা বিশেষ পদ্ধতি ছিল। সেটা পরে বলছি।

একদিন মলনে উঠে বলদগুলির পিছন পিছন খুব ছুটেছিলাম। বড়দের নিষেধ শুনিনি, ফলে শাস্তিও পেতে হল হাতে হাতে। সারা গায়ে কুড়ো লেগে কি চুলকানি, বাপরে! সেই প্রথম আর সেই শেষ। ন্যাড়া কবার আর বেলতলায় যায় বল!

দু'জন মহিলা ঐ সময় আসতেন ধান থেকে খড়ের কুড়ো বা টুকরো গুলোকে আলাদা করার কাজে। যেখানে খুব বাতাস বয় সেরকম খোলামেলা কোন জায়গায় কুলোতে করে কুড়ো শুদ্ধু ধান মাথার

উপর নিয়ে অল্প অল্প করে নীচে ফেলা হত। ধান ভারি হওয়ায় সোজা নীচে পড়ত। কিন্তু কুড়োগুলো তো হালকা। সেগুলো হাওয়ায় উড়ে গিয়ে কিছু দূরে পড়ত। ফলে দুটো স্তূপ হত – যার একটায় ধান আর অপরটায় কুড়ো থাকত। বেশ মজার বলে মনে হত ব্যপারটা।যাঁরা একাজ করতেন তাঁদের একজনের নাম আমার মনে আছে। তাঁর নাম খুশি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মজার মজার কথা বলতেন আর আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর চুলগুলি ছিল পেকে একেবারে সাদা আর কোঁকড়ানো। আর সারা মুখের চামড়ায় ছিল বয়সের ভারে কাটা আঁকিবুকি। নাম খুশি বলেই বোধহয় সর্বদাই হাসি খুশি থাকতেন।

হরিশের কথা আগেও বলেছি। আমার থেকে বয়সে বেশ বড়। কখনও বলতাম হরিশভাই, কখনও হরিশদা আবার কখনও শুধু নাম ধরে বলতাম। সে ছিল বাড়ির কাজের মানুষ। কিন্তু তাহলেও ছিল আমার বন্ধুর মত।

শীতের এক দুপুরে আমাকে বলল, চল, বেড়িয়ে আসি। কোথায় জিজ্ঞেস করতে সে বলল, গেলেই দেখতে পাবে।

সেদিন একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে চললাম ধানকাটা হয়ে গেছে এমন সব ক্ষেতের আল ধরে। দূরে দূরে ক্ষেতের মধ্যে একরকম ঘর দেখতে পেলাম যেগুলো এস্কিমোদের বাড়ি 'ইগলু'র মত দেখতে। ওদের বাড়িগুলো বরফ দিয়ে তৈরি হয়, কিন্তু এগুলো খড় আর বাঁশ দিয়ে।

এরকম একটা ঘরের কাছে থেমে হরিশদা বলল– এখানে দাঁড়াও আমি আসছি।

ঘরের দিকে ভাল করে নজর দিলাম। ঘরটা খড় আর বাঁশ দিয়ে তৈরি বটেই এমনকি মেঝেতেও পুরু করে খড় বিছানো। গদির মত নরম। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। ভেতরটা বেশ গরম। দুজনে আরাম করে শোয়া যায়। হরিশদার কাছ থেকে পরে জানতে পারি যে ক্ষেতে রাত পাহারা দরকার হলে এখানে রাতে শোয়া হয়।

যাই হোক একটু পরেই হরিশদা এল শুঁটি সুদ্ধ এক গোছা মটর গাছ নিয়ে। ঘর থেকে একটু দূরে খানিকটা খড় যোগাড় করে আগুন তৈরি করল আর মটর গাছগুলো তাতে ফেলে দিল।

কিছুক্ষনের মধ্যেই পট পট শব্দ করে সবটা পুড়ে কালো ছাইয়ে পরিনত হল।

কালো পোড়া মটরশুঁটিগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে আমাকে দিয়ে বলল –খাও।

ছাইমাখা পোড়া সেই মটরশুঁটি যে কি সুস্বাদু কি বলব। একবার সুযোগ পেলে খেয়ে দেখ। ভুলতে পারবে না।

শীতের বিকেলে বড়রা একটা খেলা খেলতেন। সেটা ছিল কতকটা ক্রিকেট আর কিছুটা বেসবল মিলিয়ে একটা খেলা। এটার নাম ছিল 'তেকাঠি' খেলা। বেশ ভাল লাগত খেলাটা দেখতে। ওরা মাঝে মাঝে ফুটবল অথবা হাডুডু এসবও খেলতেন। আমারও একটা ছোট্টমত ফুটবল ছিল। ছোটমামা বলতেন এক নম্বর বল। এর চাইতে ছোট বল নাকি হয় না। বাবা শিলং থেকে পাঠিয়েছিলেন সেটা। ছোটমামা হাওয়া ভরে দিতেন তাতে। আমি আমাদের উঠোনে খেলতাম।

বিকেল হলেই দেখতাম মামি, মাসিরা পাঁচ ছটা লন্ঠণ নিয়ে বসতেন। লন্ঠনে তেল ভরা, পলতে ঠিক করা, ময়লা চিমনিগুলো ছাই দিয়ে ঘষে ঝকঝকে করে তোলা - এইসব কাজ থাকত রোজ রোজ। তখন, মানে আজ থেকে বছর ষাটেক আগে মামার বাড়ির গ্রামে বিদ্যুতের আলো আসেনি। পাবনা জেলার সেই জামিরতা গুধিবাড়ী গ্রামে আজও বিদ্যুতের আলো এসেছে কিনা জানিনা।

কখন যে ঝুপ করে সন্ধ্যা নেমে যেত বোঝাই যেত না। সন্ধ্যা নামলে আমার ভালোও লাগত আবার ভয়ও করত।

বিকেল হলেই কাজের লোক এসে গরু দুইয়ে যেত। সন্ধ্যায় দিয়ানি সেটা জ্বাল দিতেন আর সবার জন্য বাটিতে বাটিতে ভাগ করে রাখতেন। শেষে কড়াইটা চেঁছে চাঁছি বের করতেন। সে চাঁছির কি স্বাদ- এখনোও মুখে লেগে আছে।

ছোটমামা খেলাধুলা করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে একটা লন্ঠণ জ্বালিয়ে পড়তে বসতেন। আমাকেও তাঁর সঙ্গে বসতে হত দাদুর হুকুমে- তা পড়ি আর না পড়ি। না বসলে একটা শাস্তি মজুদ থাকত - সেদিন রাতে দাদুর কাছ থেকে আর গল্প শোনা যেত না।

ছোটমামা আমার থেকে সাত-আট বছরের বড় ছিলেন। পড়তে বসলে তিনি আমার উপর নানাভাবে 'মামাগিরি' ফলাতেন। পড়ায় ফাঁকি দিলে দাদুর কানে সটান চলে যেত।

দাদুর কাছে কত গল্পই যে শুনেছি। টুনটুনির গল্প, রাক্ষস-খোক্ষসের গল্প, শিয়াল পন্ডিতের গল্প- আরো কত কি!

এর পরই খাওয়ার ডাক পড়ত।

শীতকাল হলে খাওয়ার শেষে হাত মুখ ধুয়ে এক ছুটে দিয়ানির খাটে একেবারে লেপের তলায় ঢুকে যেতাম।

সন্ধ্যাবেলার ভয়টা নিয়ে যে আর বলা হলনা। আচ্ছা সেটা যাক এখন। পরের সংখ্যায় বলব সেটা

সন্তোষ কুমার রায়
রূপনারায়ণপুর, বর্ধমান

পড়ে পাওয়া: যখন ছোট ছিলাম

তিনতলার দক্ষিণের ঘরে থাকতেন আমার মেজোকাকা বা কাকামণি– সুবিনয় রায়। বাবা মারা যাবার পরে ছাপাখানার তদারকি কাকামণিই করতেন। জার্মানি থেকে তখন নানারকম কাগজের নমুনার বই আসত আমাদের অফিসে। মোটা, পাতলা, রেশমী, খসখসে, চকচকে, এবড়োখেবড়ো, কতরকম যে কাগজ তার ঠিক নেই। কাকামণির ঘরে গেলে তিনি আমার হাতে ওই রকম একটা বই দিয়ে বলতেন– দেখ তো এর মধ্যে কোনটা চলবে। আমি বিজ্ঞের মতো পর পর কাগজের উপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে চলবে কি চলবে না বলে দিতাম। আমার ধারণা ছিল আমার বাছাই করা কাগজই আসবে জার্মানি থেকে...

...বাবা মারা যাবার দু'বছর পর অবধি সন্দেশ পত্রিকা বেরিয়েছিল। একতলার ছাপাখানায় সন্দেশ ছাপা হচ্ছে, তার তিন রঙের মলাট ছাপা হচ্ছে, একথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। ছাপাখানায় ঢুঁ মারার সময়টা ছিল দুপুরবেলা। দোতলাতেই যাওয়া হত বেশি। ঢুকলেই দেখা যেত ডাইনে সারি সারি কম্পোজিটারের দল তাদের খোপ কাটা হরফের বাক্সের উপর ঝুঁকে পড়ে হরফ বেছে বেছে পর পর বসিয়ে লেখার সঙ্গে মিলিয়ে লাইন তৈরি করছেন। সকলেরই মুখ চেনা হয়ে গিয়েছিল, ঘরে ঢুকলে সকলেই আমার দিকে চেয়ে হাসতেন। আমি তাঁদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতাম ঘরের পিছন দিকে। আজও তারপিন তেলের গন্ধ পেলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ইউ রায় এন্ড সন্সের ব্লক মেকিং ডিপার্টমেন্টের ছবি। ঘরের মাঝখানে রাখা বিরাট প্রোসেস ক্যামেরা। ক্যামেরার কাজ যে শিখে নিয়েছিল বেশ পাকা ভাবে, সেই রামদহিন প্রেসে যোগ দিয়েছিল সামান্য বেয়ারা হিসাবে। বিহারের ছেলে। রামদহিন ছিল প্রায় ঘরের লোকের মত, আর তার কাছেই ছিল আমার যত আবদার। একটা কাগজে হিজিবিজি কিছু এঁকে নিয়ে গিয়ে তার হাতে দিয়ে বলতাম, 'রামদহিন, এটা সন্দেশে বেরোবে'। রামদহিন তক্ষুণি মাথা নেড়ে বলে দিত, 'হাঁ খোখাবাবু, হাঁ'। শুধু তাই না; আমার ছবি ক্যামেরার নিচের দিকে মুখ করা লেন্সের তলায় বিছিয়ে রেখে আমাকে কোলে তুলে ক্যামেরার পিছনের ঘষা কাঁচে দেখিয়ে দিত সে ছবির উলটো ছায়া।...

যখন ছোট ছিলাম
সত্যজিত রায়
আনন্দ পাবলিশার্স
৭৫ টাকা

গত সংখ্যায় পেয়েছি: গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

গতবারের পড়ে পাওয়া কি পড়েছিলে তুমি? তাহলে নিশ্চই এতক্ষণে পিঁপড়েদের সঙ্গে তোমার বেশ খানিকটা ভাব হয়ে গেছে। আর যদি এখনো পড়া না হয়ে থাকে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি পড়ে নাও। আমি জানি তুমি ভাবছো- যে পিঁপড়ে কামড়ালে এতো জ্বালা করে, মা কোনো মিষ্টি খাবার রাখলেই লোভীদের মতো চারিদিক ঘিরে ধরে...নাছোড় হয়ে হামলা করে বার বার তাদের নিয়ে এতো আদিখ্যেতা কেন বাপু? আর কি কেউ নেই? সেই সুন্দর পাখাওয়ালা প্রজাপতি...সেই বদখত দেখতে কেঁচোটা আর সেই বেজারমুখো গঙ্গা ফড়িং যে কাকার গাড়ির উইন্ড স্ক্রিন থেকে কিছুতেই উড়ছিলো না...হাঁ করে চেয়েছিলো সবার দিকে তাদের নিয়ে লিখলেই তো হয়।

সত্যি এদের সবাইকে নিয়ে লিখেছিলেন গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। তোমরা যদি কোনোদিন তাঁর 'বাংলার কীট-পতঙ্গ' বইটা পড় তাহলে সব জানতে পারবে। কি ধৈর্য ধরে এদের নিরীক্ষণ করতেন গোপালচন্দ্র তা যেন এক গল্প কথার মতো। অনেকে ভাবতো তিনি পাগল...খামখেয়ালী। কিন্তু যারা তাঁর কাজের সাথে পরিচিত ছিলেন তাঁরা জানতেন কি কঠিন বিষয়ের ওপর গবেষণা করে চলেছেন মানুষটি।

এই সময়ে 'ইথোলজি' বা 'অ্যানিম্যাল বিহেভিয়ার' একটি সুপরিচিত বিজ্ঞানের শাখা। ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক, ডিসকভারি আর এনিমেল প্ল্যানেট ইত্যাদি টেলিভিশন চ্যানেলের সুবাদে আমরা খুবই পরিচিত এইসব শব্দ গুলো আর তাদের কর্মকান্ডের সাথে। সমুদ্রের তলায় ছোট্ট ছোট্ট মাছ থেকে শুরু করে বায়ুতে ভাসমান অদৃশ্য পোকার জীবন কান্ড আজ আমরা সহজেই বসে দেখে নিই রাতের খাবার খেতে খেতে। কিন্তু গোপালচন্দ্র যখন তাঁর কাজ শুরু করেন তখন কিন্তু এত সুগম ছিলো না তাঁর

পথ। অনেক কষ্ট করে প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে নিজের মতকে নিজের পথকে। মনে রেখো তখন কিন্তু দেশ পরাধীন। নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা তেমন না থাকায় কাজের এবং গবেষণায় এগিয়ে থাকলেও তাঁর সাথে কাজে অস্বীকার করেন এক বিজ্ঞানী। কিন্তু ফিরে আসেননি গোপালচন্দ্র। নিজে ভেঙে পড়েননি। কাজে পেয়েছেন আরো উতসাহ ও উদ্দীপনা। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে এক সামান্য চাকরী থেকে অর্জন করে নেন গবেষকের পদমর্যাদা। হাজারের ওপর প্রবন্ধ লিখেছেন বাংলায়। মাতৃভাষাতে বিজ্ঞান চর্চার যে সূত্রপাত করেছিলেন তাঁর পূর্বসূরীরা তাকেই খুব সার্থক ভাবে বহন করে নিয়ে গেছেন গোপালচন্দ্র।

জন্ম হয়েছিলো অবিভক্ত ভারতের ফরিদপুরের এক অখ্যাত গ্রাম লনসিঙে ১৮৯৫ সালের ১১ আগষ্ট। বাড়ির অবস্থা খুব একটা ভালো ছিলো না। দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছেন গোপালচন্দ্র। বাবা অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য পুজো আর স্থানীয় জমিদারের খাতা লিখে যা উপার্জন করতেন তা দিয়ে কোনোক্রমে সংসার চালাতেন মা শশিমুখীদেবী। খুব তাড়াতাড়ি কাজে ঢুকতে হয় গোপালচন্দ্রকে। মাঝপথেই থেমে যায় পড়াশুনো। স্কুল শিক্ষকের চাকরী নেন। এই সময় বিশেষভাবে সাহিত্যের দিকে আগ্রহ বাড়ে তাঁর। লিখতে থাকেন সারি গান, জারি গান,পালা গান। আবার চাকরী বদল এইভাবে ১৯১৮ সালে যখন তিনি এক বিদেশী কোম্পানীর টেলিফোন অপারেটর সেই সময় নামকরা 'প্রবাসী'পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'জৈবদ্যুতি'নামে তাঁর লেখা এক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ। সেই লেখা চোখে পড়ে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর। তিনি গোপালচন্দ্রকে নিয়ে আসেন তাঁর সদ্য প্রতিষ্ঠিত বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আজ যা বোস ইনস্টিটিউট নামে বিখ্যাত। খুব সাধারণ কাজ দিয়ে আবার নতুন করে শুরু করেন জীবনটাকে। প্রকৃতি অন্ত প্রাণ ছিলো যে মানুষটার তিনি পেলেন গবেষণার নতুন বিষয়। ১৯৩২ সালে তিনি প্রথম তাঁর গবেষণা পত্র পেশ করেন। ১৯৫১ সালে অংশ গ্রহণ করেন প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে। তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে ন্যাচারাল হিস্ট্রির মতো আন্তর্জাতিক পত্রিকায়। ১৯৬৮ সালে পেয়েছেন আনন্দ পুরষ্কার আর ১৯৭৫ সালে রবীন্দ্র পুরষ্কার।

কিন্তু পুরষ্কার দিয়েই কি মানুষটাকে চেনা যায় নাকি? কখোনোই নয়। এমনটা কখোনো মনেই এনো না। যিনি রোদে পুড়ে, জলে ভিজে পরম মমতায় লিখলেন পিঁপড়দের সমন্ধে, প্রজাপতিদের সম্বন্ধে। জানালেন মৌমাছিদের রকম সকম...ঘরকন্না...পঙ্গপালের ছবি তুললেন অভাবনীয় দক্ষতায়, লিখলেন তাদের কথা এবার সময় এসেছে তাঁকে ফিরে দেখার। তাঁকে নিয়ে পড়াশুনোর। এই লেখাটা পড়তে পড়তেই একটা প্রমিস করো না নিজের মনে মনে যে খুব তাড়াতাড়ি তুমি পড়ে ফেলবে 'বাংলার কীট পতঙ্গ' বইটা। এতো সহজ সরল ভাষায় কেই বা আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন এক অচেনা অদেখা জগতকে। কেই বা বন্ধুতা পাতাবেন পিঁপড়ের সাথে...পঙ্গপালের সাথে। তুমি কি বন্ধু হবে? তাহলে সেই মতো তৈরী হও এখন থেকে।

কল্লোল লাহিড়ী
উত্তরপাড়া, হুগলী।

ছবি
টেলিগ্রাফইন্ডিয়া

মনের মানুষ: বিশ্বকবি রবি ঠাকুর

সে আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগের কথা। কলকাতার চিতপুর এলাকার ঠাকুরবাড়ির দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সবথেকে ছোট ছেলে ছিল রবি। ছোট্ট রবির ইস্কুলে যেতে বা বাঁধাধরা নিয়মে পড়শোনা করতে কিছুতেই ভাল লাগত না। বরং বাইরের দিকের বারান্দার এক কোনে পড়ে থাকা ঠাকুরমার আমলের পাল্কিটা ছিল অনেক বেশি পছন্দের জায়গা। তার ভেতরে ঢুকে বসলেই রবি চলে যেত অন্য এক জগতে। সেখানে সে যেন একলা দ্বীপে আটকা পড়া রবিন্সন ক্রুসো, কখনও বা সে চলে যাচ্ছে বিশ্বনাথ শিকারীর সঙ্গে বাঘ ধরতে, আবার কখনও সে চলেছে উত্তাল নদীর ওপর আব্দুল মাঝির সঙ্গে কুমির ধরার গল্প শুনতে শুনতে...। আরেকটা খেলা খেলে চলে যেত ছুটির দিনের অনেক সময়। বারান্দার রেলিংগুলো হত ছাত্র, আর পড়াশোনা করে না বলে রবি মাস্টার দিত তাদেরকে আচ্ছা করে বকুনি, এমনকি মাঝে মাঝে পিটুনিও পড়ত তাদের পিঠে।

কি ভাবছ? আরে- এরকম তো আমিও মাঝে মাঝেই পড়াতে বসি আমার পুতুলগুলোকে! পড়া না পারলে কত বকেও দি, ঠিক স্কুলের ম্যাডামের মত...

কিশোর রবি

অবশ্য রবি যে একেবারেই পড়াশোনা করত না তা কিন্তু নয়। রবি স্কুলে নিয়মিতই যেত, আর বাড়িতেও নানারকম বই পড়ত। তার সাথে চলত গান শেখা, আর নিয়ম করে কুস্তি শেখা...সারাটাদিন

ছিল একদম রুটিন বাঁধা, প্রায় তোমারি মতন। কিরকম শুনবে?

শীত হোক কি গ্রীষ্ম, দিনের আলো ফোটার আগেই ঘুম থেকে উঠে কুস্তি লড়তে হত শহরের ডাকসাইটে কুস্তিগীর কানা পালোয়ানের সাথে। সেখান থেকে ফিরে এক ডাক্তারি পড়া ছাত্রে কাছে শিখতে হত মানুষের হাড় কিভাবে চিনতে হয় –একেবারে একটা আস্ত কঙ্কাল নেড়েচেড়ে! সকাল সাতটায় আসতেন নীলকমল মাস্টার, শেখাতেন অঙ্ক; সঙ্গে 'সাহিত্য' আর 'প্রাকৃত বিজ্ঞান'। এছাড়া মাঝে মাঝেই অন্য অনেকে নানা বিষয়ে পড়াতে আসতেন। ন'টা বাজলে স্নান আর সাড়ে ন'টায় ভাত খাওয়া। দশটায় পাল্কি–গাড়ি চেপে স্কুলে যাওয়া। সাড়ে চারটের পর স্কুল থেকে ফিরে এসে অভ্যাস করতে হত জিমনাসটিক। তারপর আসতেন ছবি আঁকার মাস্টারমশাই। সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠলে ইংরাজি পড়াতে আসতেন অঘোর মাস্টার। সেই পড়াশোনা শেষ হতে না হতেই চোখ ঢুলে আসত ঘুমে...

এরকম ভাবেই ছোটবেলাটা কেটেছিল ভারতবর্ষের জাতীয় কবি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ছোটবেলার এই সব ঘটনাগুলিকে মনে রেখে আর শাসনে বাঁধা নিয়ম কানুনগুলোকে নিয়ে নানারকমের সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন তিনি। তাঁর প্রতিষ্ঠা করা শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে তাই শুরু হয় অন্য রকম পড়াশোনা– গাছের নিচে, খোলা মাঠের মধ্যে, চারিপাশে প্রকৃতিকে নিয়ে।

তুমি কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কবিতা পড়েছ? যদি তুমি স্কুলে 'সহজ পাঠ' পড়, তাহলে তো কিছুটা তুমি তাঁকে চিনেই গেছ। আবার 'শিশু' এবং 'শিশু ভোলানাথ' নামের দুটি সঙ্কলনে যেসব কবিতাগুলো আছে, সেগুলি যেন সব একদম তোমারি মনের কথা। একটা কবিতার একটুখানি শুনবে নাকি?–

যত ঘন্টা, যত মিনিট, সময় আছে যত
শেষ যদি হয় চিরকালের মতো,
তখন স্কুলে নাই বা গেলেম; কেউ যদি কয় মন্দ
আমি বলব,'দশটা বাজাই বন্ধ।'
তাধিন তাধিন তাধিন।
(সময়হারা, শিশু ভোলানাথ, পৃঃ২৫)

–কি, এক্কেবারে মনের কথা না? সত্যি যদি সময় গোনাটা শেষ হয়ে যায়, আর স্কুলে না যেতে হয়, তাহলে কেমন হয়?

খালি ছোটদের জন্যই কবিতাই না, বড়দের জন্যও কত কিছু লিখেছেন তিনি – গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক। খুব ভাল ছবি আঁকতে পারতেন তিনি। এছাড়া লিখেছেন প্রায় কয়েক হাজার গান, যেগুলি পরিচিত 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' নামে। তার মধ্যে কয়েকটা অন্ততঃ গান তো তুমি জানই –

'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি/ আজ আমাদের ছুটি ও ভাই আজ আমাদের ছুটি...' বা 'ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল, লাগল যে দোল...'। কবিগুরুর লেখা দুটি গান – "জন–গণ–মন–অধিনায়ক–জয় হে" আর "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি" –যথাক্রমে ভারতবর্ষ আর বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। এরকম আরো অনেক অনেক গান আছে, আর জানো কি – অনেক গানের পেছনেই একটা করে গল্প আছে। ১৯০৫ সালে যখন বঙ্গভঙ্গ হয়, তখন রাখী উতসব পালন

করার জন্য কবিগুরু লিখেছিলেন -

"বাংলার মাটি, বাংলা জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পূণ্য হউক, পূণ্য হউক, পূণ্য হউক হে ভগবান..."

আবার ১৯১৫ সালে ইংল্যান্ডের রানী তাঁকে "নাইট" উপাধি দেন। কিন্তু ১৯১৯ সালে যখন বৃটীশ সরকার পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে অনেক নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলেন, তার প্রতিবাদ করে কবিগুরু সেই "নাইট" উপাধি ফিরিয়ে দেন। আর লেখেন একটি গান -" এ মনিহার আমায় নাহি সাজে..."

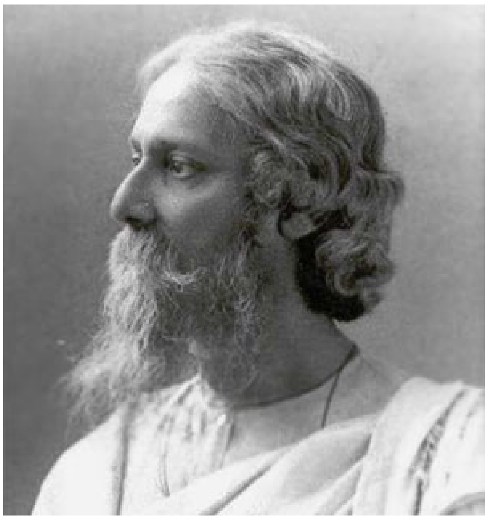

কবিগুরুর এই চেহারাটাই আমরা বেশি চিনি

১৮৬১ সালের ৭ই মে, বাংলার ২৫শে বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাই প্রতি বছর এই দিনটিকে আমরা নানারকম অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কবিগুরুকে স্মরন করি।

শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রিরা ভালবেসে রবি ঠাকুরকে ডাকতো 'গুরুদেব' নামে। আর যখন তিনি 'গীতাঞ্জলি' বইটির জন্য এশিয়া মহাদেশের থেকে প্রথম সাহিত্যে 'নোবেল' পুরস্কার পেলেন ১৯১৩ সালে, তখন থেকে তিনি হয়ে গেলেন 'বিশ্বকবি'।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভাল করে জানতে হলে তাঁর লেখা পড়তে হবে। সব লেখা তো আর এখনি পড়ে বুঝতে পারবে না, কিছু কিছু লেখা বড় হয়েই পড়তে হবে। বরং এখন তোমাকে আরেকটা মনের মতন কবিতার হদিশ দিয়ে দিইঃ

সোম মঙ্গল বুধ এরা সব
আসে তাড়াতাড়ি,
এদের ঘরে আছে বুঝি
মস্ত হাওয়া -গাড়ি?
রবিবার সে কেন, মা গো,
এমন দেরি করে?

ধীরে ধীরে পৌঁছয় সে
সকল বারের পরে।
আকাশ-পারে তার বাড়িটি
দূর কি সবার চেয়ে?
সে বুঝি, মা, তোমার মতো
গরিব-ঘরের মেয়ে?
(রবিবার, শিশু ভোলানাথ, পৃঃ২৩)

এই কবিতার বাকিটুকু নাহয় নিজেই খুঁজে পড়ে নাও না, কেমন?

মহাশ্বেতা রায়
পাটুলী, কলকাতা

ছবিঃ
উইকিপিডিয়া

দেশে-বিদেশে

মাটির নিচের রাজপ্রাসাদ

এবারে যাই মাটির তলায় এক রাজ প্রাসাদে। রাজপ্রাসাদ বললে চোখের সামনে যা ভেসে ওঠে এই প্রাসাদ ও তাই, শুধু বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায়না রাজপ্রাসাদ এর শুরু কোথায় আর শেষ কোথায়; কিংবা কটা মহল আছে, কোথায়ই বা কটা থাম। অবাক লাগছে? তাহলে আরো বলি - এই প্রাসাদে একফোঁটাও আলো ঢোকে না। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারিদিকে এত অন্ধকার যে নিজের হাতটা চোখের সামনে তুলে ধরলে দেখা যায় না।নিঃস্তব্ধ, ছমছমে, একটুও বাতাস নেই। চারিদিকে দম বন্ধকরা পরিবেশ। এই প্রাসাদে কোন রাজা নেই, রানি নেই, রাজপুত্র নেই, নেই কোন রাজকন্যা। নেই কোন প্রহরী এই রাজপ্রাসাদের সামনে। প্রাসাদ বানাতে কোন রাজ মিস্ত্রী লাগেনি, লাগেনি চূণ সুরকি। এই প্রাসাদ মানুষের বানানো নয়। কান পাতলে শুনতে পাবে না কোন আওয়াজ। ভূতের গল্পের বইতে যে সব জায়গায় ভূতেরা থাকতে ভালবাসে - সেরকম একটা জায়গা। মনে হবে আরেক পা এগোলেই কঙ্কাল আর খুলির ওপর পা পড়বে! জোর করে দেখার চেষ্টা করলে দেখবে কোণ থেকে দুটো জ্বলজ্বলে চোখ তোমাকে দেখছে। এই একটা রক্তখেকো বাদুর উড়ে গায়ে পড়ল বলে। কিংবা আগে আগে যে লোকটা এতক্ষন ধীরে ধীরে হাঁটছিল, সে হটাত পেছন ঘুরে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে- তার চোখ দুটো জ্বলছে- ভয়ানক একটা হাসি হেসে ঘাড় নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছে। ভয় লাগছে নাকি? ভাবছ ছুটে পালানোর রাস্তাটা কোথায়? নাকি ভাবছ কে বানাল এই প্রাসাদ? আর এত অন্ধকারই বা কেন?

ফ্লোরিডার ক্যাভার্নস স্টেট পার্কের প্রবেশপথ। আমাদের গাইড গুহার দরজা খুলছেন

এবার আমরা যাব দুটো দারুন জায়গায়- ফ্লোরিডা ক্যাভার্ন্স স্টেট পার্ক, ফ্লোরিডা তে আর ওনান্ডাগা কেভস স্টেট পার্ক, মিসৌরি তে। দুটো জায়গাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে।

এই জায়গা দুটোয় ঢুকতে গেলে একজন গাইড এর সাথে যেতে হয়। আমাদের আগে চলেছে আমাদের গাইড। মাটির মধ্যে হটাত একটা গর্ত আর তাতে সিঁড়ি করা আছে গুহার মধ্যে যাওয়ার জন্য। দর্শকদের দেখার জন্য ভেতরে কিছু আলোর ব্যবস্থা রয়েছে। ভেতরে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়বে ছাদ থেকে লম্বা লম্বা কি সব ঝুলছে। তারপর চোখটা ধাতস্থ হয়ে গেলে দেখলাম সে মাটির থেকেও কি সব ওপোরের দিকে উঠে আছে। গাইড বললেন যে ছাত থেকে যেটা ঝুলছে সেটা স্ট্যালাকটাইট (stalactite) আর মাটি থেকে যেটা ওপর দিকে উঠে আছে সেটা স্ট্যালাগমাইট (stalagmite)।

স্ট্যালাকটাইট, ছাত থেকে ঝুলছে, ওনান্ডাগা, মিসৌরি

স্ট্যালাগমাইট, মাটির থেকে উঠেছে,ওনান্ডাগা, মিসৌরি

মনে রাখার সুবিধার জন্য গাইড বলে দিলেন স্ট্যালাগমাইট (stalagmite) এ 'g' আছে। 'G' হল 'ground' -জমির প্রথম অক্ষর। এরপর আমাদের বললেন অনুমান করতে ওই স্ট্যালাকটাইট এর বয়স কতে পারে? কি মনে হয় তোমার? কত দিন লাগতে পারে ওই পাথরটা জমতে? দুই বছর, পাঁচ বছর, দশ বছর? না। ভাবতে অবাক লাগবে এইরকম সরু, কোল্ড ড্রিঙ্ক খাওয়ার স্ট্র এর মতন সরু একটা জমতে পাঁচ থেকে দশ হাজার বছর লাগে!!

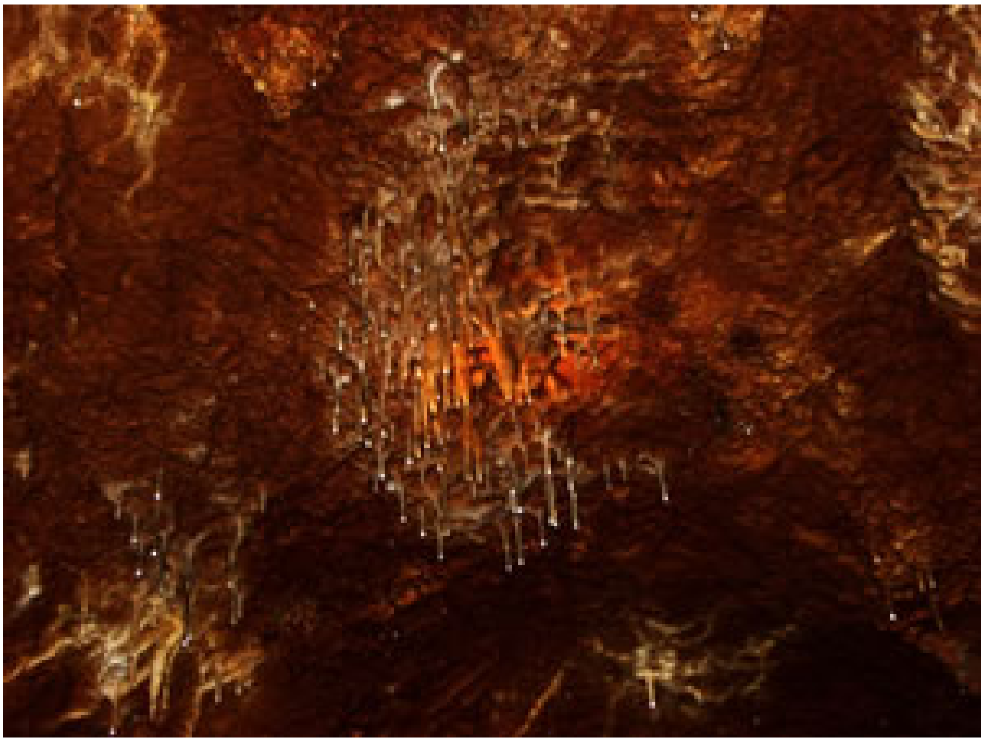

স্ট্র স্ট্যালাকটাইট, ওনান্ডাগা, মিসৌরি

জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে বিশেষ ধরনের পাথরের মধ্যে দিয়ে পড়তে থাকলে এই ধরনের আকার তৈরি হতে পারে। মুক্তো তৈরি হবার মতনই আশ্চর্যজনক এই ঘটনা। তাই ওই গুহার মধ্যে যেখানে যেখানে ওইরকম আকৃতি হয়ে আছে, সেখানে হাত দেওয়া নিষেধ। হাত দিলে কি হবে জানতো? আর স্ট্যালাকটাইট বা স্ট্যালাগমাইট বাড়তে পারবে না। কারন আমাদের হাত তো তেলতেল। হাতের তেল লেগে গেলে পাথর আর জমতে পারবে না। সবচেয়ে মজা হল, যেখানে স্ট্যালাকটাইট হবে, তার ঠিক নিচে, একদম নিচে, স্ট্যালাগমাইট হবেই হবে।

কিন্ত এরকম হয় কেন? তাহলে শোনো, এই সবের শুরু এক ফোঁটা জল থেকে। মাটির ওপর থেকে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে গুহার মধ্যে ঢুকল। জল মাটির মধ্যে দিয়ে যায় বলে আশে পাশে যা আছে তা জলের মধ্যে গুলে যায়। তাই আশে পাশে যদি চুনাপাথর জাতীয় পাথর থাকে তাহলে জলের মধ্যে চুণাপাথরের মিশ্রন বেশি হয়ে যায়। এবারে জলটা যখন গুহাতে পড়ছে তখন সেই চুনাপাথর জমতে শুরু করে, আর তৈরি হয় স্ট্যালাকটাইট। আর জল যখন, সেটা তো মাধ্যাকর্ষণের জন্য নিচের দিকে পড়বেই। তাই গুহার ছাত থেকে জল ফোঁটা ফোঁটা করে মেঝেতে পড়ে। সেইখানে মেঝেতে তৈরি হয় স্ট্যালাগমাইট, একদম স্ট্যালাকটাইট এর ঠিক নিচে।

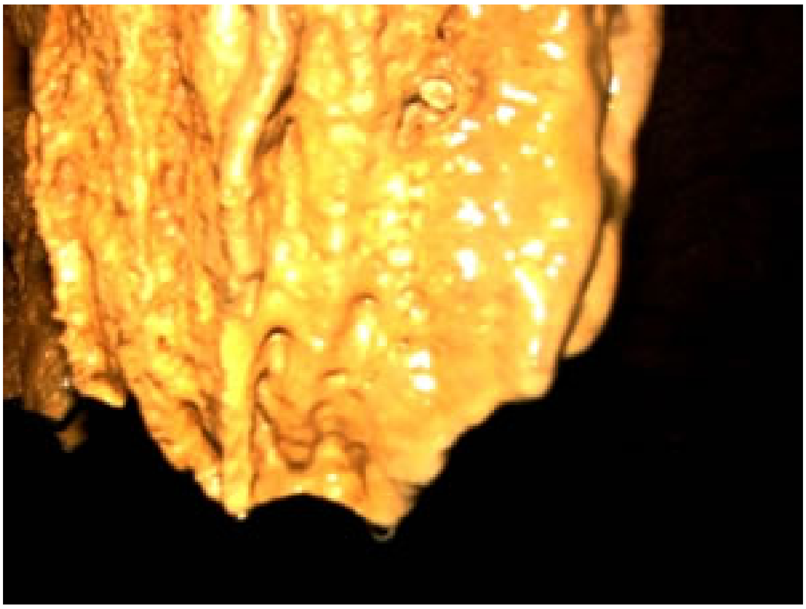

জলের ফোঁটা পড়ছে

স্ট্যালাকটাইট আর স্ট্যালাগমাইট কিসের মত দেখতে ভাব তো? দেখে মনে হয়না বিভিন্ন মাপের গাজর ঝুলছে ছাত থেকে? তাই বিজ্ঞানীরা স্ট্যালাকটাইট এর আকৃতি গাজরের সাথে তুলনা করেন। তবে এরা কিন্তু গাজরের মত তাড়াতাড়ি বাড়েনা। বছরে সাধারনভাবে ১ সেন্টিমিটারের দশ ভাগের এক ভাগ হয়ত বাড়ে। তাইত হাজার হাজার বছর সময় লাগে একটা স্ট্যালাকটাইট বা স্ট্যালাগমাইট তৈরি হতে। আর এইভাবে জমতে জমতে একসময় ছাত থেকে নেমে আসা স্ট্যালাকটাইট আর জমি থেকে বাড়তে থাকা স্ট্যালাগমাইট জুড়ে যায়। তখন সেটা একটা থামের মত হয়ে যায়। কোন থাম বিশাল মোটা, কোনটা সরু, কোনটা ল্যাম্প-পোস্টের মত দেখতে। নিচের ছবিগুলি ওনান্ডাগাতে তোলা -

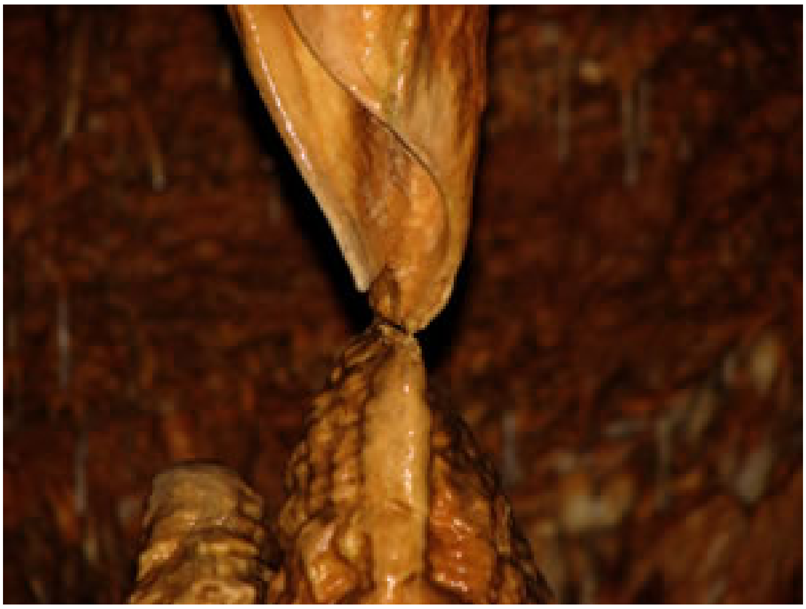

স্ট্যালাকটাইট-স্ট্যালাগমাইট জুড়ছে

স্ট্যালাকটাইট-স্ট্যালাগমাইট জুড়ে থাম হয়ে গেছে।এই থামটা আর বড় হচ্ছে না। তাই হাত দেওয়া যায় -ফ্লোরিডা ক্যাভার্নস স্টেট পার্ক

কি মনে হচ্ছে কেউ কি বাঁচতে পারে এই পরিবেশে? নিশ্চয় পারে। প্রকৃতিতে জীবন যেখানে সুযোগ পায় বেড়ে ওঠে। এই গুহাপ্রাসাদের মধ্যেও জীবন আছে। বাদুর, সালামান্ডার এর মত প্রাণী এইরকম পরিবেশ ভাল বাসে। এছাড়া চিংড়ির মত দেখতে একধরনের প্রাণীও থাকে গুহার ভেতরে হলে থাকা জলে।

ঘুমন্ত বাদুর

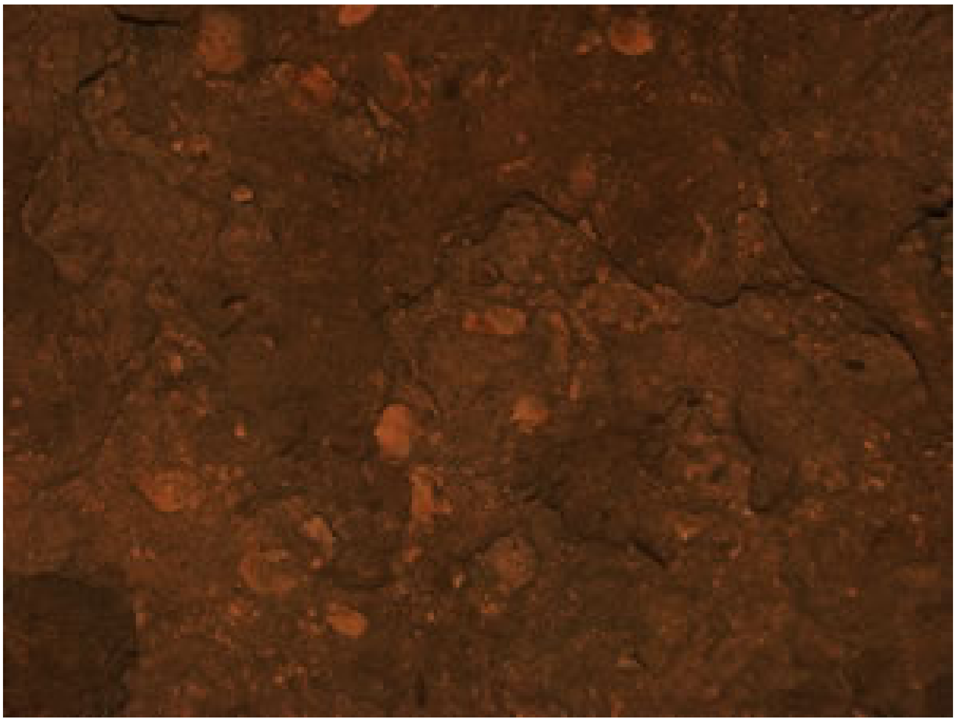

ঝিনুকের জীবাশ্ম

তিমির দাঁতের জীবাশ্ম ওপরের সব ছবি ফ্লোরিডা ক্যাভার্নস স্টেট পার্ক এ তোলা।

এবারে আমরা আরেকটা ঘরে যাই। রাস্তা করা আছে দেখার সুবিধার জন্য। কিছু জায়গা এত নিচু আর সরু যে মাথা নুইয়ে যেতে হয়।

গুহার ভেতর- চারিপাশে স্ট্যালাকটাইট-স্ট্যালাগমাইট

গুহার ভেতরে কোন কোন জায়গা এত বড় যে কথা বললে গম গম আওয়াজ ওঠে। এই মাটির নিচের প্রাসাদে কোন ঘর আবার খুব সাজানো, যেন নক্সা করা পর্দা ঝুলছে ছাত থেকে জমি অবধি। আবার অন্য দিকে তাকালে মনে হবে যেন বাগান হয়ে আছে কোন ঘরে আবার ফোয়ারা, আর জলের বুকে যেন পদ্ম, শালুক ফুটে আছে। এই প্রাসাদের প্রধান দরবারের ছাত ৯০ ফুট উচুঁ কিন্তু। চারিপাশে নক্সা করা থাম মেঝে থেকে ছাত অবধি। জায়গাটা এত বড় যে তার মধ্যে চারটে ক্রিকেট স্টেডিয়াম ঢুকে যাবে। নিচের কিছু ছবি আমার খুব ভাল লাগে, ভাবলাম তোমাকেও দেখাই -

জলের মধ্যে স্ট্যালাগমাইট- যেন ফুল ফুটেছে

নদীর মত দেখতে স্ট্যালাকটাইট জমা হয়েছে (মিসৌরি)

গুহার মধ্যে জলে স্ট্যালাকটাইটের ছায়া

এই স্ট্যালাকটাইটগুলো দেখতে পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান ছবির জলদস্যুদের দাড়ির মত লাগছে না?

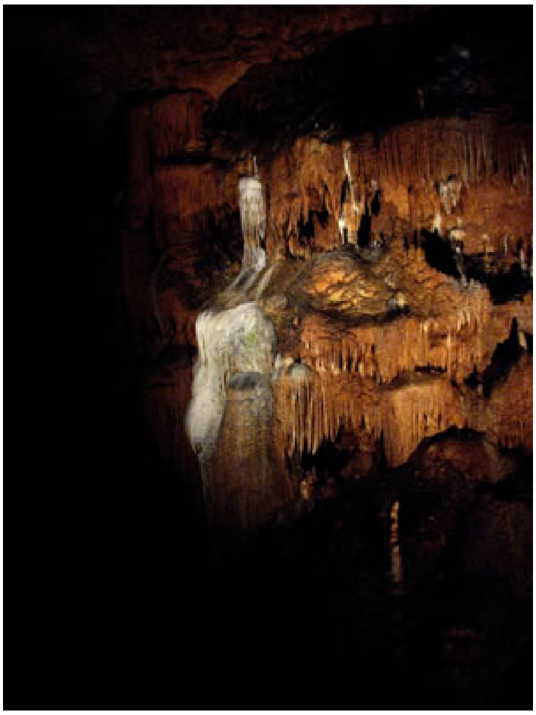

কত বড় আর উঁচু ছাত ভাব- ওপর থেকে স্ট্যালাকটাইটের ঝর্না নামছে

আজ এই পর্যন্ত থাক। এখন এখানে বসন্তের ফুলে ভরে আছে চারিদিক। টেক্সাসের রাস্তার দুধারে বুনোফুল হয়ে থাকে। রাস্তা ধরে গেলে রাস্তার দুপাশে লাল, নীল, বেগুনি, হলুদ সব রঙের ফুলে ভরে আছে। খুব সুন্দর লাগে দেখতে। এবারের ছবিগুলি আমার স্ত্রী আর আমার তোলা। যদি স্ট্যালাকটাইট আর স্ট্যালাগমাইট এর বিষয়ে আরো জানতে চাও, তাহলে http://en.wikipedia.org/wiki/Stalagmite আর http://en.wikipedia.org/wiki/Stalactite পড়ে নিও।

ছবি ও লেখা
দেবাশীষ পাল
ওকলাহোমা সিটি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

দু'চাকায় দুনিয়া

সেদিন একটা অদ্ভুত মজা হলো। শনিবার, ছুটির দিনের সকালে উত্তেজনায় একেবারে সাড়ে ছটায় ঘুম থেকে উঠে পড়লাম। শীতের ভোর,চারিদিকে অন্ধকার ঘুটঘুটি,তার মধ্যে দাঁত মেজে গপগপ করে মুখে চারটে বিস্কুট গুঁজে সাইকেলের চাকায় পাম্প দিতে বসে গেলাম। সাতটার মধ্যে বেরিয়ে যেতে হবে যে। তুমি নিশ্চই অনেক সকালে ঘুম থেকে ওঠো...মানে তুমি না উঠলেও কেউ কেউ তো ওঠে। আর শনিবারে আমার নিজের ঘুম ভাঙে ভীষণ দেরী করে। লজ্জায় মাথা কাটা যাবার ভয়ে আর সময়টা বললাম না।

আমার নতুন সাইকেল। বাঁ হাতে সাতটা গিয়ার আর সেই সাতটা গিয়ারের প্রত্যেকটার জন্য হাই, লো, আর মিডিয়াম এই তিনতে গিয়ার। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কটা, আমি মুখে বলি একুশটা। তাতে মনে হয় যেন এটা সাইকেল নয় রকেট। সত্যি কথাটা এই যে রকেট না হলেও সাইকেলটা খুব ভালো আর বেশ জোরে যায়। আমি তো সাঁ সাঁ করে সেটা নিয়ে সমুদ্রের ধার দিয়ে আটটা নাগাদ সেই চত্বরটার সামনে গেলাম যেখানে সবাইকে জমায়েত হতে হবে। প্রথমে তো শীতের হাওয়া একেবারে অস্থির করে দিলো। কিন্তু এই শীত আর বেশিক্ষণ থাকবে না। কারণ এক যে বেলা বাড়বে। কারণ দুই যে সাইকেল চালালে এমনিতেই শীত বেশ কমে যায়। আর সবচেয়ে বড় কারণ হলো এই যে...আমি তো একা নই আরো অন্তত দুশো সাইকেল আমাদের সঙ্গে যাবে।

ভেবে দেখো দেখি আমাদের সামনে পুলিশ, পেছনে পুলিশ নীল আলো জ্বালিয়ে পিঁয়...পিঁয় করে সাইরেন দিয়ে যাচ্ছে আর আমরা নানা রঙের গেঞ্জি, প্যান্ট আর হেলমেট পরে পনপন করে রাস্তা দিয়ে চালাচ্ছি। আমাদের জন্য রাস্তার সব গাড়ি আটকে দেওয়া হয়েছে, লোকে হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখছে। এইটা হল বড় রাস্তা। আমরা এই পথে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার পথ গিয়ে পড়বো একটা ছোট রাস্তায়। আর সেখান থেকে মজার শুরু। ঠিক বাঁদিকে একটা ফুলে ভর্তি খাড়া ঢাল পাহাড় থেকে নেমে গেছে সমুদ্রের ওপরে। নিচে ট্রেন যাচ্ছে, ক্যাঁচ করে স্টেশনে থামছে আবার ঘটাং ঘট ঘচাং ঘচ শব্দ করে স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছে। আরো মজার কথা এই যে সাইকেলে করে আমরা দিনের শেষে ঠিক যেখানে গিয়ে

থামবো এই ট্রেন গুলোও ঠিক সেখানে গিয়েই থামবে। খালি ওরা অনেকটা এগিয়ে আর আমরা অনেকটা পিছিয়ে।

কিন্তু তাতে কি? আমরা তো চারপাশ দেখতে দেখতে চালাচ্ছি। শুধু কি ট্রেন লাইন? ওদিকে ঝকঝকে দিন দেখে সমুদ্রে যে কতলোক ছোট ছোট পাল তোলা নৌকা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে আর কি বলবো? গেলো বছর আমরাও একটা নৌকা নিয়ে নিজেরা চালিয়ে একটা নদীতে চারদিন ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি। সেই গল্প পরে হবে। এত গুলো নৌকা কিন্তু কোনো জাহাজ নেই। থাকবে কি করে? সারা দিন তো মোটে দুটো জাহাজ ভোরে আসে আর সন্ধ্যে বেলায় যায়। এদিকে সাইকেল চালাতে চালাতে রোদ বেড়েছে শীত কেটেছে, আমাদের মনে আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু এত লোক খামোকা শনিবারের সকাল সকাল উঠে সাইকেল চালাচ্ছে কেনো?

আরে সেটা তো এখোনো তোমাকে বলাই হয় নি!

একদিন বিকেলে, সে প্রায় মাস খানেক আগে হবে, আমি বাড়ি থেকে সাইকেলটা নিয়ে বেরোচ্ছি এমন সময় হঠাত এক ভদ্র মহিলা আমার হাতে একটা ছাপানো কাগজ দিয়ে কি সব বিড়বিড় করে বলে আবার চলে গেলেন। কাগজটা হাতে নিয়ে তো আমার চক্ষুস্থির। আমারই পাড়ার দুটো ছেলে তাদের সাইকেল নিয়ে নাকি এই পৃথিবীটার চারিদিকে একটা গোটা পাক দিতে বেরোচ্ছে। জলের ওপর দিয়ে হয়তো জাহাজে কিম্বা প্লেনে যাবে বাকিটা পুরো সাইকেলে। আর তাই ওরা চায়, যত লোক সম্ভব ওদের সঙ্গে যেন প্রথম দিনটা সাইকেল চালায়। দু চাকায় বিশ্ব জয় করতে অবশ্য ওরা দুম করে বেরোয়নি। তার আগে প্রায় দেড় বছর প্ল্যান করেছে, প্র্যাক্টিস করেছে, মানুষজনের সাথে কথা বলে পয়সা কড়ির যোগাড় করেছে। এমনকি মিশরের দক্ষিণ থেকে উত্তরে নীল নদ বরাবর সাইকেল চালিয়েছে।

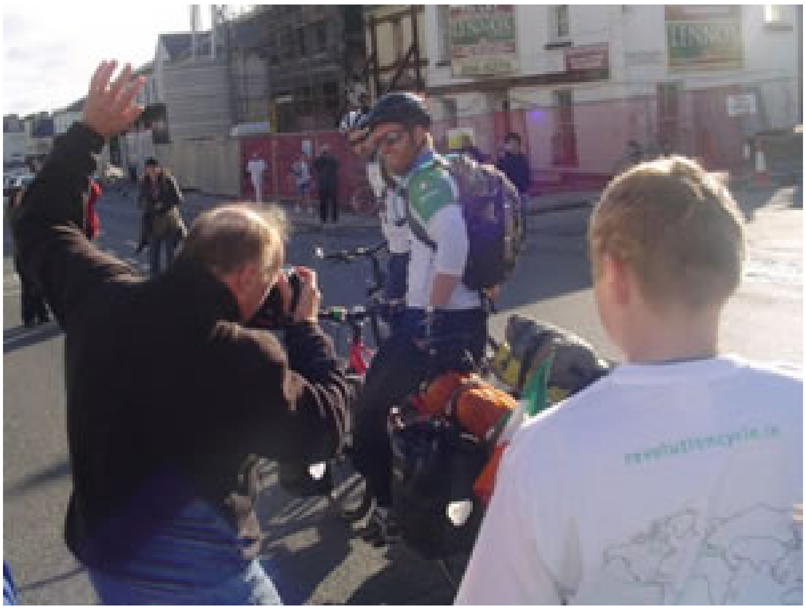

যাত্রা শুরু

এখন যে ওরা সাইকেলে করে বিশ্ব ভ্রমণে যাচ্ছে, তাতে আবার ওদের সাইকেলের ডিজাইনটা নিজেরাই চিন্তা ভাবনা করে একটু বদলে নিয়েছে। এই যে এতোদিন ধরে ওরা যাবে, তার রসদ কতটা নেবে,

কিভাবে নেবে, কোথায় ক'কিলো ঝোলাবে সব হিসেব করেছে। ব্যালান্স রাখতে হবে তো। একটা সাইকেলের পিছনে খুব নীচু চাকাওয়ালা একখানা বাক্স জুড়েছে। সীট গুলোকে কেটে নিজেদের দেহের আকার মতো করে নিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধে যাচ্ছে।

যে ছেলে দুটো এই দুঃসাহসিক কান্ডটা করছে তাদের নাম হলো সাইমন আর ফার্গাল। সাইমন আমাদের সবার সামনে চালাচ্ছে আর ফার্গাল সবার পিছনে। দুজনেই অতি চমতকার ছেলে। কারো সাইকেলের চেন পড়ে গেলে ফার্গাল এসে চট করে সেটা আবার তুলে দিচ্ছে। আবার আঁকা বাঁকা পাহাড়ি রাস্তায় কোন বিপজ্জনক বাঁক দেখলেই সাইমন চেঁচিয়ে সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছে। আমরা যে এত ঘন্টা চালাচ্ছি মনেই হচ্ছে না। সাইমন আর ফার্গালের মা, বাবা ভাই বোন সবাই একসাথে আমাদের সঙ্গে চালাচ্ছে।

বিকেল নাগাদ আমরা পাহাড় টাহাড় পেরিয়ে সেই যেখান থেকে ওরা টা টা করে বিশ্ব ভ্রমণে পাড়ি দেবে সেখানে গেলাম। সে কি অবস্থা। এই টুকু টাউন কিন্তু লোকে লোকাকার। কেউ ড্রাম বাজাচ্ছে, কেউ হুইসল দিচ্ছে, কেউ নাচছে, কেউ রঙ করা শোলার বল বাতাসে মুঠো মুঠো করে ছুঁড়ছে। কেউ লেবু জল কেউ কেক,কেউ স্যুপ এই সব খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। আমাদের তো তখন নিজেকে হিরো মনে হচ্ছে। রাজা বাদশার মত সাইকেলে হেলান দিয়ে আমরা খাচ্ছি। এর প্রায় আধ ঘন্টা পরে ওরা আমাদের টা টা করে দুটো সাইকেল নিয়ে রাস্তার মোড় ঘুরে পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়ে গেলো।

বলো তো দেখি এখন ওরা কোথায়?

যখন এই লেখা লিখছি, ওরা তখন আন্দিজ পর্বতমালায় লাতিন আমেরিকার পেরুতে কুজকো বলে একটা শহরে। ওদের চারিদিকে একগাদা লামা। বৌদ্ধ লামা নয় কিন্তু, সেই যে উটের মতো একটা জন্তু ক্যাপ্টেন হ্যাডকের মুখে থুথু ছুঁড়তো, সেই লামা। অতি শান্ত চেহারা। কারো কারো মাথায় বিনুনি বাঁধা। কতদূর সাইকেল চালিয়েছে ভাবো দেখি। আমি তোমাকে যে গোপন খবরটা দিলাম সেটা তোমরাও পেতে পারো।
আন্দিজ পর্বতমালায় লামার দল

বলিভিয়ার পথে ছুটছে সাইকেল

পথের বন্ধুদের সাথে সাইমন আর ফার্গাল

ওরা ওদের যাত্রা পথের রানিং কমেন্ট্রি দিচ্ছে ইন্টারনেটে www.revolutioncycle.ie তে। সঙ্গে ছবি আর ভিডিও। গেলেই বুঝতে পারবে ওরা গত ক মাসে কি কান্ডটাই না করে চলেছে। আর এখন ঠিক কোথায় আছে সেটাও জেনে যেতে পারো। তোমরা ওদের ওয়েবসাইটে রেগুলার ফলো করতে পারো, এরপর ওরা যায় কোথায়। এখনো প্রায় অর্ধেক রাস্তা বাঁকি। আর কি চাই ছুটির দিন দেখে তুমিও বন্ধুদের সাথে সাইকেল নিয়ে অন্তত বাড়ির আশেপাশে বেড়িয়ে পড়ো এবার। দেখবে কি মজাটাই না হচ্ছে।

বিক্রম
ডাবলিন
আয়ারল্যান্ড

ছবিঃ রেভলিউশন সাইকেল

ছবির খবর: স্বর্গের শিশুরা

আজকে তোমার কাছে আমার একটা খুব ভাললাগা ছবি নিয়ে গল্প করব। ১৯৯৭ সালে ইরানে তৈরি এই ছবিটার নাম 'চিলড্রেন অফ হেভেন'/' বাচেহা এ আসেমান'। বাংলা করলে বলা যেতে পারে 'স্বর্গের শিশুরা'। ছবিটি তৈরি করছেন ইরানের বিখ্যাত পরিচালক মাজিদ মাজিদি। এবার গল্পটা বলি।

ছোট্ট ছেলে আলি তার বোনের প্রিয় গোলাপি রঙের জুতোজোড়া মুচির কাছ থেকে সারিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। ফেরার পথে আলি ঢুকল সব্জির দোকান থেকে কিছু আলু নিতে। হাতের জিনিষগুলো রেখে গেল দোকানের বাইরে। এমন সময় সেই ফেরিওয়ালা, যে কিনা পুরোনো জিনিষ কেনাবেচা করে, সে এসে দাড়াঁল দোকানের সামনে। দোকানদারের ফেলে দেওয়া জিনিষপত্রের সাথে সে তুলে নিয়ে চলে গেল আলির জুতোর ঠোঙ্গাটাকেও। আলু নিয়ে বেরিয়ে এসে আলি তো আর জুতোজোড়া খুঁজে পায়না। মুখভার করে বাড়ি ফিরে এল সে। তার ছোট বোন জোহরেকে সে সত্যি কথাটা খুলে বলল। দুঃখের চোটে জোহরের তো চোখ ফেটে জল এসে গেল। আলি জোহরে কে কথা দিল জুতোজোড়া খুঁজে এনে দেবে। যতদিন না পাচ্ছে, জোহরে তার নিজের জুতোজোড়া পড়েই নাহয় স্কুলে যাক। মা- বাবাকে যেন এক্ষুনি নালিশ না করে দেয় বোন আবার... আলি নাহয় বোনকে তার নিজের পেনটাই দিয়ে দেবে...

আলি

জোহরে

আলি-জোহরের বাবা খুব সামান্য কাজ করেন। তাঁর পক্ষে হটাত করে একজোড়া নতুন জুতো কিনে আনা সম্ভব নয়। তাই বাবা- মা টের পাওয়ার আগেই জোহরের গোলাপি রঙের জুতোজোড়া খুঁজে পাওয়াটা যে খুব জরুরি দুই ভাই বোনের কাছে!

কিন্তু সে জুতো কি আর খুঁজে পাওয়া যায় নাকি? জোহরে আর কি করে, দাদার ছেঁড়া, ময়লা জুতোজোড়া পায়ে দিয়ে সকালবেলা স্কুলে যায়। স্কুল ছুটি হলে দৌড়ে দৌড়ে বাড়ি ফেরে। গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকে তার দাদা। জুতো পালটিয়ে নিয়ে সে আরো জোরে ছুট লাগায় তার স্কুলের দিকে। মাঝে মাঝে দেরিও হয়ে যায়। বকাও খায় খুব।

এর মধ্যে আবার জোহরে একদিন দেখে তার সেই হারিয়ে যাওয়া জুতোজোড়া পরে আরেকটি মেয়ে স্কুলে আসছে। দেখে তো সে অবাক। মেয়েটির পেছন পেছন গিয়ে তার বাড়ি চিনে আসে সে। দাদাকে নিয়ে গিয়ে দেখায়ও। কিন্তু কি করে মেয়েটার কাছে যে ওই জুতোজোড়া গেল, ভেবেই পায় না দুজনে। আসলে ওরা জানবে কি করে, ঐ মেয়েটার বাবা সেই ফেরিওয়ালার কাছ থেকে ওই জুতোজোড়া কিনেছেন! জোহরে স্কুলে মেয়েটির সাথে কথাও বলে, কিন্তু মুখ ফুটে আর বলতে পারেনা যে আসলে ওই জুতোজোড়া ওর নিজের।

দুই ভাই- বোন যাচ্ছে জুতো খুঁজতে

তারপর একদিন আলি স্কুলে জানতে পারল যে অঞ্চলের সব স্কুলের ছেলেদের মধ্যে এক দূরপাল্লার দৌড় প্রতিযোগিতা হবে। আর তার তৃতীয় পুরষ্কার হল এক জোড়া নতুন স্নিকার!! ছোট্ট দাদা আলি তার ছোট্ট বোন জোহরেকে কথা দিল সে দৌড়ে তৃতীয় হবে আর স্নিকার জোড়া এনে সেদুটির বদলে বোনকে নতুন একজোড়া মনের মতন জুতো কিনে দেবে।

আলি তো গেল দৌড়াতে। কিন্তু সে কি তৃতীয় হলে পারল? বোনকে কি নতুন জুতো এনে দিতে পারল? ছবিটা দেখতে দেখতে সবার মত তুমিও কিন্তু আলির সাথে খুঁজতে শুরু করবে জোহরের জুতোজোড়া। আর মনে মনে চাইবে আলি যেন দৌড়ে তৃতীয়ই হয়, প্রথম যেন না হয়।

শেষটুকুন আর বলব না। বরং বাড়ির বড়দের বলে দেখ তো এনে দিতে পারেন কিনা এই ছবিটির সিডি বা ডিভিডি। আলি আর জোহরের চরিত্রে অভিনয় করেছে যে দুটি ছোট ছেলে মেয়ে - আমির ফারুখ হাশেমিয়ান আর বাহারে সিদ্দিকি, তাদের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়ে ছোট -বড় সবাই। আর আমরা সবাই ধন্যবাদ জানাই পরিচালক মাজিদ মাজিদিকে, ছোটদের নিয়ে এত সুন্দর একটা ছবি আমাদের দেওয়ার জন্য।

মহাশ্বেতা রায়
পাটুলী, কলকাতা

ছবিঃ সিনেমাজিদি

বায়োস্কোপের বারোকথা: এডউইন এস পোর্টার

পর্ব তিন

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে সিনেমা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠছিল। এই বড় হয়ে যাওয়ার পাঠশালা কিন্তু আটলান্টিকের ওপারে, নিউ ইয়র্ক শহরে। সেখানকার একজন সাহেবের গল্প আমরা শোনাব যার নাম এডউইন পোর্টার। মেলিয়ে ছবির মাধ্যমে গল্প বলেছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝে উঠতে পারেননি কিভাবে ছবিগুলোকে এমন ভাবে সাজানো সম্ভব যাতে কখনই মনে হয়না যে ছবিগুলো জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। পোর্টার ঠিক এই কাজটাই সেরে ফেললেন। তিনি আনলেন গল্প বলার নতুন কায়দা। তিনি এমন ভাবে গল্প বললেন যে ছবিও থেলে থাকল না আর একসঙ্গে দুটো বা তিনটে গল্প বলা গেল।

এডউইন এস পোর্টার

সিনেমায় যেটুকু হাতের কাজ লাগে পোর্টার সেটুকু খুব ভালো করে জানতেন। তিনি কর্মজীবন শুরু করেন এডিসন সাহেবের কোম্পানিতে মেকানিক হিসাবে। সেখানে কাজ করতে করতেই তিনি মাথা ঘামিয়ে পার করে ফেলেন কিভাবে বইএর মত করে সিনেমার গল্প বলতে হয়। উপন্যাসে যেমন নানা

ঘটনার সমাবেশ হয়, তিনি ছবিতে সেই স্বাদ দিতে চেয়েছিলেন।

তাঁর সবথেকে বিখ্যাত ছবি হল 'দ্য গ্রেট ট্রেন রবারি' (১৯০৩)। ১২ মিনিটের এই ছবির বেশিরভাগটাই স্টুডিও তে তোলা। স্টুডিও সেটের মধ্যে আলো ব্যবহারে তিনি যে কত দক্ষ ছিলেন তার প্রমান এই ছবি। এই ছবির আউটডোর শুটিং অবশ্য হয়েছিল নিউ জার্সি শহরের কাছে।

ছবির পোস্টার

'দ্য গ্রেট ট্রেন রবারি' কে বলা হয় প্রথম ওয়েস্টার্ন ছবি (western). কথাটা হয়ত একটু সহজ করে বলি। তোমরা নিশ্চয় বিখ্যাত হিন্দি ছবি 'শোলে' দেখেছ? জয়-বীরু আর গব্বর সিং ডাকাতের গল্প? 'দ্য গ্রেট ট্রেন রবারি' কে বলতে পার 'শোলে'র ঠাকুমা!! এখানে একটা ট্রেন ডাকাতি আর কিভাবে দস্যুদের উদ্দ্যেশ্য ব্যর্থ হল সেই গল্প বলা আছে। পোর্টার এখানে তৈরি করলেন প্যারালেল অ্যাকশন, ব্যবহার করলেন ক্রস- কাটিং। তার ফলে আমরা নানারকম উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে গল্পটাকে পেলাম।

ছবির একটি দৃশ্য

শেষ দৃশ্যে একজন ডাকাত দর্শকদের দিকেই গুলি ছুঁড়ছে!

এইরে! প্যারালেল অ্যাকশন বা ক্রস-কাটিং এসব তো খুব ভারি শব্দ! কি করে বুঝব! জিনিষটা কিন্তু খুব সহজ। ধর, ট্রেনে ডাকাতি হচ্ছে। আর ওদিকে, টেলিগ্রাফ অফিসের অপারেটর টেলিগ্রাফ করে খবরটা চারিদিকে পৌঁছাতে চাইছে। সে অতি কষ্টে গিয়ে কাছের সরাইখানায় সবাইকে খবর দেয়।তখন সবাই বন্দুক বাগিয়ে ডাকাতদের ধরতে বেরিয়ে পড়ে। ততক্ষনে তো ডাকাতরা ট্রেন চালিয়ে অনেকদূর চলে গেছে।পোর্টার করলেন কি, এমনভাবে দুটো ঘটনাকেই দেখালেন যে দর্শক পুরো ব্যাপারটা টানটান উত্তেজনা নিয়ে দেখল- ভুলেই গেল যে দুটো আসলে আলাদা ঘটনা আলাদা জায়গায় ঘটছে। এ এক নতুন রকমের অভিজ্ঞতা হল দর্শকদের কাছে! গল্পটাকে যেন আরো ভাল করে বুঝতে শুরু করল তারা। গল্প বলার এই কৌশল তৈরি করার জন্য পোর্টার বিখ্যাত।

পোর্টার যখন এডিসন স্টুডিও ছেড়ে দিলেন তখন ১৯০৯ সাল। তার আগের বছর এক তরুন অভিনেতা এসে তাঁর কাছে অভিনয়ের সুযোগ চান। পোর্টার তাঁকে সুযোগও দেন। তৈরি হয় একটি অতি সাধারন ছবি, যার নাম Rescued From An Eagle's Nest. এই কথাটা মনে থাকার কথা নয় এতদিন পরে। কিন্তু সিনেমা নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা সেদিনের সেই তরুন অভিনেতাটিকে মনে রেখেছেন। কেন বলতো? কারণ তিনিই প্রথম সিনেমাকে যথার্থ সিনেমা করে তুললেন। ১৯১৪ সালে তৈরি তাঁর ছবি 'বার্থ অফ এ নেশন' [Birth of a Nation] এর হাত ধরেই শুরু হল প্রথম কাহিনীচিত্র - বা গল্প বলা ছবি। তাঁর নাম ডেভিড ওয়র্ক গ্রিফিথ। সত্যজিত রায় তাঁকে বলেছিলেন 'ধ্রুপদী চলচ্চিত্রের পিতা'। ভাবছ ধ্রুপদী চলচ্চিত্র মানে কি? -ডেভিড ওয়র্ক গ্রিফিথ আর ধ্রুপদী চলচ্চিত্র নিয়ে আমরা গল্প বলব এর পরের বার।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক, চলচ্চিত্র বিদ্যা বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ছবিঃ উইকিপিডিয়া

পরশমণি: বাষ্পের ক্ষমতা

আগের সংখ্যায় (বসন্ত সংখ্যা ২০০৯) তোমাদেরকে কেটলির গুন গুন করার কথা শুনিয়েছিলাম। সঙ্গে আরোও অনেক কথা ছিল।

কেটলি নিয়ে আর দু'একটা কথা হবে নাকি?

হবে? তাহলে চল, রান্নাঘরে হানা দিই আর একবার। কখন সেটা করব জিজ্ঞেস করছ? রান্নাঘর যখন ফাঁকা থাকবে তখন গেলেই হল। তবে পাশে মা বা অন্য কেউ বড় একজন থাকা উচিত।

কেটলিতে জল ভর্তি করে নিয়ে গ্যাসের ওপর বসাও। জলটা একটু বেশি নিতে হবে কিন্তু। তাহলে বাষ্পটা নল দিয়ে বেরোতে পারবে না। কেননা বাষ্প বেরোবার নলের মুখটা জলের মধ্যে ডুবে থাকবে। আর সেটাই আমরা চাই।

জল ফুটতে থাকলে বাষ্প তৈরি হয়ে সেটা নল দিয়ে বেরোতে না পেরে ভেতরে জমতে থাকবে। ভেতরে বাষ্প জমছে কিনা একটু পরেই টের পাবে ঢাকনার খটাং খটাং আওয়াজ শুনে। নলের মুখ দিয়ে বেরোতে না পেরে বাষ্প ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে ঐ ঢাকনা সরিয়ে। আর তাতেই ঐ শব্দ।

গায়ে জোর না থাকলে কি সেটা সম্ভব?

এটাই হল বাষ্পের ঠেলা বা ধাক্কা মারের ক্ষমতা। ইংরাজিতে একে বলে steam power বা বাষ্পীয় ক্ষমতা।

এই ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর কথা চলেছিল বেশ কয়েকশ' বছর ধরে। কবে থেকে? তা ধর ১৫৫০-৫১ সাল থেকে। সেই সময় থেকে নানা ধরনের কাজ করার জন্য তৈরি হয়েছে নানারকমের স্টীম বা বাষ্পীয় ইঞ্জিন।

কল-কারখানায় তো কাজ করেছেই, এমনকি রেল গাড়ি চালাবার কাজেও লেগেছে এই ইঞ্জিন।

এখন অবশ্য স্টীম-ইঞ্জিন আর রেলগাড়ী চালাবার কাজে ব্যবহার করা হয়না। ইলেকট্রিক বা ডীসেল ইঞ্জিনেই গাড়ী চলে। কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্তও বাষ্পীয় ইঞ্জিনই ব্যবহার হত।
প্রথম রেল-ইঞ্জিন তৈরি করেন জর্জ স্টিফেনসন। ইনি মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ইঞ্জিন বানানোর কাজে হাত লাগান এবং সফল হন। এই ইঞ্জিন প্রথমে কয়লার ওয়াগন টানার কাজে লাগানো হলেও পরে যাত্রী

পরিবহনের কাজে ব্যবহার হতে থাকে।

জর্জ স্টিফেনসন

প্রথম স্টীম-ইঞ্জিন দিয়ে যাত্রী পরিবহনের কাজ কবে শুরু হয়েছিল জান? -সেই ১৮২৫ সালে। স্টীম-ইঞ্জিন দেখেছ? স্টীম ইঞ্জিন আজকাল বিভিন্ন দেশে প্রদর্শনশালায় রাখা থাকে। যেমন, কলকাতায় হাওড়া স্টেশনের রেল মিউজিয়ামে যত্ন করে সাজিয়ে রাখা আছে পুরোনো দিনের স্মৃতি হিসাবে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা তোমাদের জানিয়ে রাখি। কবে প্রথম হাওড়া স্টেশন থেকে রেল চলেছে জান? সেটা হল ১৮৫৮ সালের ১৫ই আগস্ট। প্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিনটানা রেলগাড়ি চলেছিল হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত। যে ইঞ্জিনটা ঐ গাড়িটাকে টেনেছিল তার আদুরে নাম ছিল "ফেয়ারি কুইন" [Fairy Queen]। বাংলায় কি বলব একে -"পরী রানী"?

ফেয়ারি কুইন

সন্তোষ কুমার রায়
রূপনারায়ণপুর, বর্ধমান

ছবিঃ
উইকিপিডিয়া
ভিসিটইন্ডিয়া

জানা-অজানা: চেনা-অচেনা চায়নাটাউন

ধপধপে ফর্সা, চ্যাপ্টা মিষ্টি গোল মুখ, গালে গোলাপি রঙের আভা, তারি মাঝখানে বসানো একটা চ্যাপ্টা নাক, সেই নাকের দুই ধারে দুটি ছোট্ট কৌতুহলী চোখ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার ক্যামেরার লেন্স এর দিকে...তার চারপাশে তারই মত আরও কিছু ছোট্ট মানুষ ছুটে বেড়াচ্ছে...কেউ বা বেঞ্চের উপর উঠে লাফাচ্ছে, কেউ বা পেন্সিল চিবোতে চিবোতে মাতৃভাষার কিছু অক্ষর খাতায় এঁকে ফেলছে...আঁকতেই হচ্ছে, কারণ ভাষাটাই এইরকম - এঁকে সব বোঝাতে হয়। ইংরাজিতে যাকে বলে 'pictorial language'।

ভাষাটা চাইনিজ, আর জায়গাটা ট্যাংরার একটি স্কুল...চিনা শিশুদের জন্য এই স্কুলের নাম 'কিম পাউ চাইনিজ স্কুল'।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ক্যামেরার দিকে...

ট্যাংরা চেন কি? ট্যাংরা হল মধ্য কলকাতার একটি বিশেষ অঞ্চল। খুব বেশি পরিচিত 'চায়না টাউন' নামে। চলো, একটু ঘুরে দেখি চায়না টাউন, আর জেনে নিই এই জায়গাটার বিশেষ ইতিহাস।

চিনারা প্রথম কলকাতায় আসে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। প্রথম চিনা মানুষ যিনি চিনদেশ থেকে চা এবং চিনি এনেছিলেন তাঁর নাম 'আতাচিউ' [Atachew]। অনেকে মনে করেন এই 'আতাচিউ' নাম থেকেই এসেছে কলকাতার কাছেই 'ইছাপুর'জায়গাটির নাম। 'চা' এবং 'টি' দুটি শব্দই চিনা ভাষার দুটি আঞ্চলিক

রূপ। একই পানীয়ের জন্য একটি শব্দ গ্রহণ করেছে ইংরেজরা আর অন্যটি নিয়েছি আমরা মানে বাঙালীরা।

১৯৩০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে চিনে গৃহযুদ্ধ হয়। সেই সময় হাজারে হাজারে মানুষ চিনদেশ ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। এক সময় কলকাতায় প্রায় দশ হাজার চিনা মানুষ ছিলেন। কিন্তু ১৯৬২ সালে শুরু হল চিন ভারত যুদ্ধ। তখন আবার সেইসব ঘরছাড়া মানুষ কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন অন্য দেশে। যাঁদের এখানে ব্যবসা ছিল, তাঁরা রয়ে গেলেন। তাঁদের নিয়েই কলকাতার চায়না টাউন এখনো তার শব্দ-গন্ধ বাঁচিয়ে রেখেছে।

চায়না টাউনের চিনারা মূলতঃ চামড়া পাকা করার কারখানা চালান, যাকে বলে 'ট্যানারি'। কেউ বা চালান বিখ্যাত সেইসব রেস্তোঁরা, যেখানে কলকাতার মানুষেরা কারণে-অকারণে দারুন সব চাইনিজ খাবার খেতে যান। আর আছে 'সিং চিউং সস ফ্যাক্টরি', যেখানে তৈরি সুস্বাদু সস ওইসব রেস্তোঁরাগুলিতে বিক্রি হয়।

ট্যানারির কিছু ছবি

চায়নাটাউনের বিখ্যাত রেস্তোঁরাগুলি

যাঁরা রেস্তোঁরা বা ট্যানারিতে কাজ করেন না, তাঁরা ছোটখাটো দোকান নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, কেউ আবার রিকশা চালান।

চায়না টাউনে আছে দুটি ক্লাব হাউস। সেখানে 'Overseas Chinese Commerce in India' নামে একটি সম্পূর্ন চিনা ভাষার পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার মাত্র ৩০০ টি কপি ছাপা হয়! বুঝতেই পারছ, কলকাতা এখন কতজন চিনা মানুষ থাকতে পারেন!

Overseas Chinese Commerce of India

印度商報

কলকাতা থেকে প্রকাশিত চিনাভাষায় পত্রিকা

চায়না টাউনে মাত্র দুটি স্কুল - একটির কথা তো আগেই বলেছি, অন্যটির নাম 'গ্রেস লিং লাং ইংলিশ

মিডিয়াম স্কুল'। দুটি স্কুলের সাথে আছে উপাসনালয়। 'গ্রেস লিং লাং' এ আছে একটি চার্চ, আর 'কিম পাউ' এর সাথে আছে চিনা দেবতার মন্দির।

স্কুলের ভিতর কচিকাঁচারা

চিনা উপাসনালয়

উপাসনালয়ের ভিতর

চিনাদের ক্যালেন্ডার চাঁদের গতিবিধি অনুসরণ করে তৈরি করা হয়। এই ক্যালেন্ডার অনুসারে ২১ দিনে মাস হয়, তাই যখন ইংরাজি ক্যালেন্ডারের তুলনায় ২১ দিনের বেশি পিছিয়ে পড়ে, তখন একটা নতুন মাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

চায়না টাউনের চিনারা কালীপুজো করেন...ভেবে কেমন অবাক লাগে না? মন্দিরের নাম 'চাইনিজ কালী মন্দির'। এই মন্দিরে শুধুমাত্র চিনারা পুজো করতে যান।

চায়না টাউন ছাড়া আরেকটা জায়গার কথা না বললে কলকাতা শহরের চিনাদের নিয়ে এই গল্পটা শেষ হবে না, সেটা হল টেরিটিবাজার বা টিরেটা বাজার। টিরেটা বাজারে প্রায় ৮-১০টি চিনা পরিবার এখনও বসবাস করেন। প্রতিদিন ভোর ছটা থেকে সকাল আটটা অবধি এখানে একটি "ব্রেকফাস্ট মার্কেট" বসে, যেখানে ঘরে তৈরি জিভে-জল-আনা চিনা খাবার বিক্রি হয়। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে চলে গেলেই হল...

টেরিটিবাজারের ব্রেকফাস্ট মার্কেট

কেমন লাগল তোমার এই চায়না টাউন ভ্রমণ? এরপর যেদিন কোন এক রেস্তোঁরায় খেতে যাবে তোমার প্রিয় চাইনিজ ডিশ, তখন নিশ্চয় মনে পড়ে যাবে এই চায়না টাউনের গল্প, তাই না?

লেখা ও ছবিঃ
রশ্মি সেন
বালিগঞ্জ, কলকাতা

কমিকস্ কাহিনী: বাড়ির মধ্যে সার্কাস

সার্কাস মানেই তো যেখানে থাকে হুপার্স,এক্রোব্যাটস,জাগলার আর দমফাটা হাসির সেই সব জোকাররা। কিন্তু আমাদের ফ্যামিলিতে তো মা, বাবা, দাদা, দিদি, বোনেরা থাকে তাহলে সেখানে সার্কাস হবে কী করে?

সার্কাস মানেই তো মজা। একবার ভেবে দেখো তো আমাদের সবার বাড়িতেও কি নানা রকমের মজার কান্ড কারখানা ঘটে চলে না!সেখানে আমরা মাঝে মাঝেই এমন সব কান্ড করে বসি যা সার্কাসকেও হার মানায়। এই মজার কথাটা প্রথম বুঝতে পারেন বিল কেন(Bil Keane)নামের এক ভদ্রলোক। তিনিই শুরু করেন ফ্যামিলি সার্কাস (Family Circus)নামের এক কমিক স্ট্রিপ।

বিল নিজে নিজেই আঁকতে শিখেছেন। 'দ্য নিউ ইয়র্কার' (The New Yorker) ম্যাগাজিনে প্রকাশিত কার্টুন দেখে আঁকা প্র্যাকটিস করতেন আর মনে মনে ভাবতেন চারপাশে যা কিছু দেখছেন একদিন সব এঁকে ফেলবেন। বড় হয়ে সত্যি তিনি নানান ম্যাগাজিনে ছবি আঁকতে শুরু করেন। বিল ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সৈনিক। ভাবতে অবাক লাগে যুদ্ধের সময়েও তাঁর কার্টুন আঁকা বন্ধ হয়নি। যুদ্ধ করতে করতে যখন তিনি জাপানে তখন ইয়াঙ্ক (Yank) ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর কমিক স্ট্রিপ। অস্ট্রেলিয়াতে পৌঁছে তাঁর দেখা হয়ে যায় একটা মিষ্টি মেয়ে থেল কার্নের (Thel Cerne) সঙ্গে। পাঁচ বছর পরে থেলের সাথে বিয়ে হয় বিলের। শুরু হয় বিলের নিজের জীবনের ফ্যামিলি সার্কাস।

বিল তখন ব্যস্ত চ্যানেল চাকল্স (Channel Chuckles)নামের একটি কমিক স্ট্রিপ নিয়ে। বউ থেল হিমসিম খাচ্ছে বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে। আর এই সবের মধ্যেও,এত ব্যস্ততার মধ্যেও বিল লক্ষ্য করছেন তাঁর বাড়িটা একটা মজার জায়গা। পাঁচ ছেলে মেয়ে গেইল্, নিল্, গ্লেন্, ক্রিস্টোফার এবং জিফ সেইসঙ্গে তাদের মা থেল ও বিল নিজে রোজই কিছু না কিছু মজার কান্ড কারখানা ঘটিয়ে চলেছে। আর এদের নিয়েই ১৯৬০ সালে বিল শুরু করলেন তাঁর সাড়া জাগানো দুষ্টু মিষ্টি কমিক স্ট্রিপ

ফ্যামিলি সার্কাস। পরিবারের সদস্যরাই হলেন এই কমিক স্ট্রিপের চরিত্র,পাত্র পাত্রী।

ফ্যামিলি সার্কাস কমিক স্ট্রিপে আছে একজন মা,একজন কার্টুনিস্ট বাবা ও তাদের চার ছেলে মেয়ে বিলি,ডলি,জেফি আর পিজে। এছাড়াও আছেন তাদের ঠাকুমা আর আছে দুটো পোষা কুকুর ও একটি বিড়াল। বিল এই কমিক স্ট্রিপটা একটি বৃত্তের মধ্যেই আঁকতে পছন্দ করতেন।তিনি মনে করতেন এই ভাবেই হয়তো বোঝাতে পারবেন পরিবারটির খুশিতে ভরা জীবন যাপন। বিল তুলে ধরলেন নানা মজার ঘটনা। যেমন ধর মাকে বাচ্চারা জন্মদিন এ কেক বানিয়ে চমকে দিতে চায়। এদিকে মা অবাক; বাচ্চাগুলো গেল কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে রান্না ঘরে গিয়ে দেখা গেল সেখানে সব কিছু লন্ডভন্ড। একজন ডিম নিয়ে খেলা করছে; একজন বারোটা মোমবাতি নিয়ে বসে ভাবছে মা'র বয়স কত; আরেকজন চকোলেট খেয়েই চলেছে।

তাঁর এই প্রচেষ্টা যথাযথ সম্মান পায় যখন ফ্যামিলি সার্কাস কিং ফিচারস্ সিন্ডিকেটের (King Features Syndicate) সদস্য হয়ে যায়। আরো অনেক পুরষ্কার আর সম্মান পান বিল। এই কমিক স্ট্রিপের চরিত্রদের কারো বয়স না বাড়লেও বিলের ছেলে মেয়েরা বড় হয়েছে। গ্লেন ওয়াল্ট ডিজনি পিকচার্সের একজন বিখ্যাত অ্যানিমেটর। Little Mermaid আর Ariel তো তাঁরই সৃষ্টি। বিলও বুড়ো হয়েছেন কিন্তু ফ্যামিলি সার্কাসে নতুন নতুন ঘটনা আজও ঘটেচলেছে। বিল এর মেয়ে গেইল্ যার আদলে তৈরী হয়েছিল ডলি চরিত্রটি সে এখন নিজেদের কোম্পানীর কাজ কর্ম দেখাশুনো করে। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে বিল এখন নতুন গল্পের সন্ধান পান কোথা থেকে? তাঁর ছেলে মেয়েরা তো বড় হয়ে গেছে। আরে ভাই বিল কি থেমে থাকার পাত্র? বিল এখন নতুন গল্পের রসদ পান তাঁর নাতি নাতনিদের কাছ থেকে। এখন বিলের সাথে ছেলে জেফও কাজে হাত লাগিয়েছে ফ্যামিলি সার্কাসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাবার মতো জেফও এখন তার নিজের ছেলে মেয়েদের কার্যকলাপ খেয়াল করে চলে। সে খেয়াল করে তার বাচ্চারাও মন দিয়ে খবরের কাগজে পড়ে। জেফ জানে তারা আসলে কমিক্স পড়ছে, ঠিক জেফ যেমনটি পড়তো তার ছোটবেলায়। তার বাচ্চাদের রকম সকম আর দুষ্টুমিগুলো একের পর এক উঠে আসে ফ্যামিলি সার্কাসে।

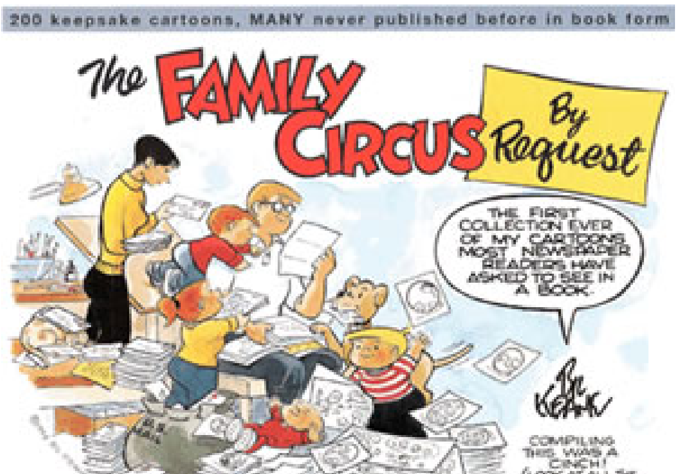

ফ্যামিলি সার্কাস পড়তে পড়তে মনে হয় আরে আমাদের বাড়িতেও তো এমনই সব মজার ঘটনা ঘটে চলে। পিজে যে কিনা ফ্যামিলি সার্কাসের ভাই বোনেদের মধ্যে সবার থেকে ছোটো,কথাও বলতে শেখেনি

সেও কিন্তু নানান মজার ঘটনা ঘটিয়ে চুপচাপ সরে পড়ে। যেমন ধরো মায়ের লিপস্টিক দিয়ে দেওয়ালে আঁকিবুকি কেটে ভালো মানুষটি সেজে বসে থাকা এরকম আরো কত কি। তোমার বাড়িতেও নিশ্চই নানান রকমের মজার ঘটনা ঘটে, সেই সব মজার ঘটনা ছবি এঁকে খুব তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও ইচ্ছামতীকে। কে জানে হয়তো তুমিই একদিন হয়ে উঠবে আমাদের বিল কেন।

লেখা :
পূর্বাশা
নিউআলিপুর, কলকাতা

ছবিঃ
পূর্বাশা
ফ্যামিলিসার্কাস

<u>এক্কা-দোক্কা: খেলা শুরুর গল্প</u>

সে অনেক দিন আগের কথা...হ্যাঁ তা প্রায় পাঁচকোটি বছর হবে, মানুষের উদ্ভব হয়েছিলো পৃথিবীতে। সময়ের গতিতে বিবর্তনের ধাপে ধাপে এই প্রাচীন মানুষই (Primates) ক্রমে নিপুণ মানুষ (Homo habilis) থেকে বুদ্ধিমান মানুষে (Homo sapiens) রূপান্তরিত হতে হতে তৈরী হয়েছে আজকের এই মানব সমাজ।

তুমি নিশ্চই জানো আদিম মানুষের জীবন ধারণের প্রথম ও একমাত্র উপায় ছিলো শিকার করা। অন্য সব প্রাণীর চেয়ে শারীরিক শক্তিতে দুর্বল মানুষকে তাই সহায়তা নিতে হয়েছে অস্ত্রের। পাথরের ভোঁতা সেই অস্ত্র সময়ের সিঁড়ি বেয়ে পরিবর্তিত হয়েছে ধাতুর অস্ত্র সম্ভারে। জীবন রক্ষায়,খাদ্যের প্রয়োজনে একাকী অথবা যূথবদ্ধ ভাবে গোষ্ঠীতে থাকা মানুষের শিকার সন্ধানের আদিম চেষ্টাই আজকের সব খেলাধূলার শিকড়। কি অবাক হচ্ছো নাকি? কিন্তু ভেবে দেখো অন্য প্রতিযোগীকে দৌড়ে হারিয়ে শিকার করে নিজের গোষ্ঠীতে ফিরে আসা কিম্বা সাঁতারে জলাভূমি, নদী পার হয়ে অন্য এক ভূখন্ডে বসতি স্থাপন করার প্রাণান্ত প্রয়াসে শারিরীক সক্ষমতা আর বুদ্ধিই তাদের সম্বল। কাউকে হারিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ...বলতে পারো একটা চ্যালেঞ্জ।

আমাদের এই যাযাবর শিকারী জীবনের থেকে আজকের উত্তরণ সম্ভব হয়েছে আমাদেরই কোনো এক আদি জননীর উদ্ভাবিত কৃষি পদ্ধতির সৌজন্যে। কৃষির ফলেই আমাদের সমাজ জীবন স্থিত হবার সুযোগ পেয়েছে। পেয়েছে তার পরম প্রিয় গেরস্থালী। বাবা, মা, ভাই, বোন, ঠাকুমা, দিদিমা সবাইকে নিয়ে হৈ হৈ করা এক সংসার। আদিম সেই শিকারী জীবনের অবসান ঘটেছে। কিন্তু সেই কৃষি জীবনের সুন্দর ছান্দিক সুরের মধ্যে কোথাও না কোথাও থেকে গেছে আমাদের সেই আদিম জীবনের শিকারের ছবি। বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে মনে হয়তো বা কোনো এক খেলার রূপ নিয়ে। মানুষ সেগুলো তখন বেশ তাড়িয়ে উপভোগ করেছে সুস্থ বিনোদনের তাগিদে।

ভাবছো এ আবার কি...! ফুটবল বা ক্রিকেট খেলার সময় থোড়াই না আমরা এরকম ভাবি। আচ্ছা যদি একটু গম্ভীর হয়ে ভাবি তাতে ক্ষতি কি? যেমন ধরো সেই সব খেলা গুলো তীরন্দাজি, অসিচালনা, কুস্তি, মুষ্ঠি যুদ্ধ,লাঠিখেলা,ঘোড়-দৌড় কত কত খেলার কথা বলবো আর। ব্যক্তিগত ভাবে এইসব খেলার দক্ষতা বিচারে বিজয়ী হবার গৌরবে গোষ্ঠীতে সেই মানুষটার একটা আলাদা পরিচয়

হতো। স্মমান বাড়তো। গোষ্ঠীর লোকজন গর্ব করে বলতেন তাঁর কথা।

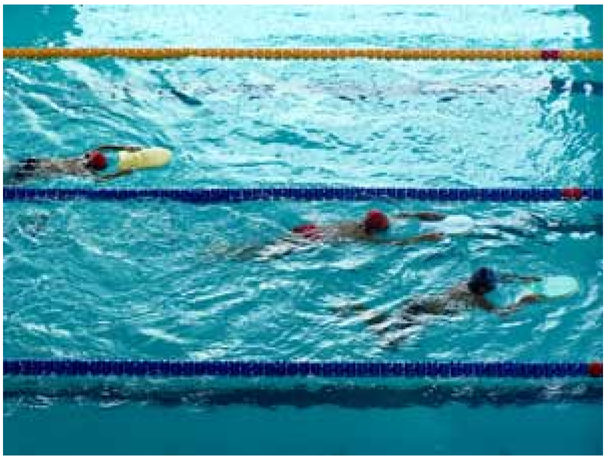

সাঁতারুর দল

চাকার আবিষ্কারের পরেই সামাজিক মানুষও অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। দ্রুত হয়েছিলো তাদের জীবন যাপন প্রণালী। গোলাকার বস্তু নিয়ে খেলার একটা প্রবণতাও বেড়ে গিয়েছিলো। শুরু হল গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে খেলা। বিজয়ী গোষ্ঠীর আনন্দ তখন আর দেখে কে। পুরষ্কারের কথা নিশ্চই জানতে ইচ্ছে করছে। দাঁড়াও তাহলে বলি তোমাকে, খুব একটা আহামরি ছিলো না কিন্তু সেইসব বিশেষ করে আজ তোমরা খেলে যে সব পাও তার কাছে খুবই নগন্য। পুরস্কৃত মানুষটিকে দেওয়া হলো হয়তো সামান্য পশু মাংস কিম্বা জীবন ধারণের কিছু টুকরো টাকরা। পুরষ্কার সামান্য হলে কি হবে তার সাথে সম্মানটাই ছিল অসামান্য। রাতারাতি হিরো হয়ে যেত সেই দল কিম্বা গোষ্ঠী। খেলার এই ইতিহাসের এখোনো কিছু নিদির্শন আমরা পাই খ্রীষ্ট জন্মের আগে মিশরীয় ছবিতে স্থাপত্যে।

মহাভারতের কুরু-পান্ডবের অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষার প্রথম শিক্ষক ছিলেন কৃপাচার্য। একদিন রাজকুমারদের গুলিডান্ডা (ডাংগুলি?)খেলার মাঝে গোলকটি একটি কূপের মধ্যে পড়ে যায়। গুলিটি উদ্ধারে রাজকুমারদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা দেখে দ্রোণাচার্য তাঁর অদ্ভুত পারদর্শিতায় কুশ দিয়ে সেটিকে উদ্ধার করে দেন। ফলে কৃপাচার্যকে সরিয়ে তিনিই রাজকুমারদের অস্ত্র গুরু রূপে ভীষ্মের মনোনয়ন পান। দ্রোণাচার্য শিক্ষান্তে তাঁর ছাত্রদের অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষার কুশলতা প্রদর্শনের জন্য যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন সেইখানেই সূত পুত্র বলে উপহাসিত হন কর্ণ। রাজকুমার দুর্যোধনের বদান্যতায় অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শনে অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলেন বটে কিন্তু রাজকুমারদের সাথে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি পাননি। এরপর ঠিক কি ঘটেছিলো সেটা না হয় আর এক দিন তোমাকে বলবো।

পুরাণের আলো-আঁধারির এই কথা কাহিনী ছেড়ে আমরা যদি আধুনিক যুগের খেলাধুলার কথায় ফিরি তবে দেখা যাবে খেলার ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার আগেও মিশর, মেসোপটেমিয়া, চিন ও ভারতবর্ষে খেলাধুলোর অনেক ইতিহাস ছড়ানো ছিটোনো রয়েছে। ওলিম্পিক এর আগে খেলাধুলোর অলিখিত ইতিহাসের একমাত্র ব্যতিক্রম মিশরের দেওয়াল চিত্রে কুস্তি প্রতিযোগিতার বিশদ ছবি।

পৃথিবীতে ধারাবাহিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূত্রপাত প্রাচীন গ্রীসে। ৭০৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রথম অনুষ্ঠিত এই

প্রতিযোগিতা চার বছর অন্তর নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সম্রাট থেওদোসিওস এই বিশাল প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দিয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন। কিংবদন্তি অনুসারে প্রাচীন এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উতপত্তি পেলোপ্‌স এবং ওইনোমস্‌-এই দুই বিখ্যাত দৌড়বীরের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে।

অন্য আর এক কিংবদন্তিতে সুবিখ্যাত গ্রীক বীর হেরাক্লেস'ই এই প্রতিযোগিতার প্রতিষ্ঠাতা। গ্রীসের পেলোপস্‌লেসের এলিস প্রদেশে গ্রীক দেবতা জিউস এর দেবস্থান ওলিম্পিয়া থেকেই প্রাচীন মহান এই ক্রীড়া উতসবের উতপত্তি আর বিকাশ।

প্রাচীন অলিম্পিয়া, যেখানে অলিম্পিক শুরু হয়

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঁর পিয়ের দ্য কুবেয়ারত্যাঁর(১৮৬৩-১৯৩৭) ঐকান্তিক চেষ্টায় পুনরায় এই অলিম্পিক শুরু হয়। সেই অলিম্পিক এর আসরে যুক্ত হয় অন্যতম একটি প্রতিযোগিতা ম্যারাথন দৌড়। ফাইডিপাইডিস নামের এক সংবাদ বাহক মানুষের স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই প্রতিযোগিতার নামের মধ্যে। ৪৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ম্যারাথন রণাঙ্গন থেকে গ্রীস বাহিনীর যুদ্ধ জয়ের খবর প্রায় ছাব্বিশ মাইল অতিক্রম করে সেই সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন ফাইডিপাইডিস। সংবাদ পৌঁছে দেবার পরই তাঁর মৃত্যু হয়। এথেন্সে অনুষ্ঠিত প্রথম অলিম্পিকে এক গ্রীক দৌড় বীর এই ম্যারাথন দৌড় জিতে তাঁর দেশবাসীকে গর্বিত করেছিলেন। তুমি নিশ্চই জানো আধুনিক অলিম্পিকের মূল লক্ষ্য শুধু প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহ করা নয়-খেলাধুলোর মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি দেশ ও জাতির মধ্যে মৈত্রী, প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা।

দৌড় প্রতিযোগিতা

যে খেলা শুরু হয়েছিলো নিছক বিনোদনের জন্য...যে খেলার স্মৃতিতে ছিলো আদিম জীবনের কষ্টকর রেশ...ছিলো যুদ্ধের এক করুণ কাহিনী...সেই খেলাই আজ দেশ-কাল-গন্ডির সীমানা ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত। খেলার ইতিহাস বিশাল। লিখিত আকারে যা আছে অলিখিত থেকে গেছে অনেক কিছু। সেই সব জানা-অজানা নানান কথা নিয়ে আবার তোমার কাছে ফিরে আসবো আগামী সংখ্যায়। ততদিনে তুমি আরো কিছু নতুন খেলা শিখে নাও। ভালো থেকো।

প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
বালী, হাওড়া

ছবিঃ
উইকিপিডিয়া
এস-এক্স-সি

আঁকিবুকি

ঋষিরাজ পুষ্পলা, ৫ বছর, সেন্ট লুইস, মিসৌরি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

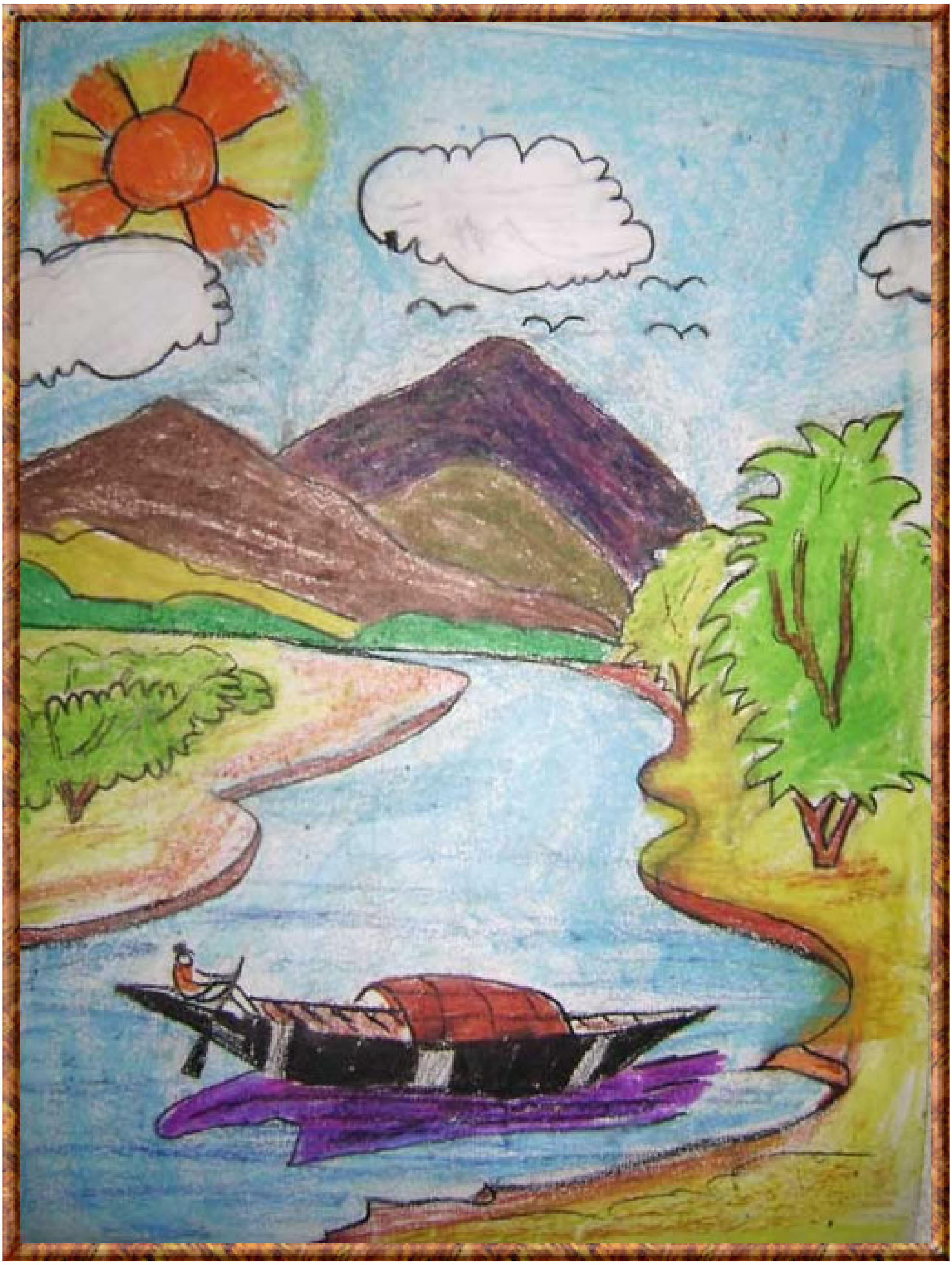

উজ্জয়িনী বিশ্বাস, ৫ বছর, চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান

মালিকা দত্ত, ৮ বছর, সন্তোষপুর, কলকাতা